

এ চারি আশ্রমই পৃথক । বেদ ও শ্রুতির বিধান অনুসারে সকল আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ এবং তিনি অন্য তিন আশ্রমীর অধিপালক । উদ্ধাহ তত্ত্ব দ্বিত নামন পুরাণের একটি বচন এই,

চত্বার আশ্রমশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ ।

গার্হস্থ্যঃ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকঃ ।

ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাঃ স্তয় এব হি ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্য মাশ্রম দ্বিতয়ং বিশাঃ ।

গার্হস্থ্য মুচিত্তৈবকং শূদ্রস্য কণ মাচরেৎ ।

ব্রাহ্মণের চারি আশ্রম—গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক । ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন আশ্রম । ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য বৈশ্যের এই দুই আশ্রম । শূদ্রের গৃহস্থ্যশ্রমই একমাত্র কর্তব্য ।

শাস্ত্রমতে অন্য তিন আশ্রম কেহ অবলম্বন করুন না করুন, গৃহস্থ্যশ্রম সকলেরই পক্ষে আশ্রয়ক । এই ক্ষম্ভ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং পরম কর্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে । এই জন্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে দববৎ সেবা করিবার যেমন ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, স্বামীর প্রতি পত্নীকে সমাদর ও অজ্ঞা করিবার শাসন ও বিহিত হইয়াছে ।

যাবন্ন বিন্দতে জায়াতাবদক্কো ভবেৎ পুমান্ ।

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ অর্দ্ধেক থাকেন । স্ত্রী পুরুষের অপরি অর্দ্ধাংশ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন ।

সম্বৃত্তৌ ভার্য্যা ভর্তা, ভর্তা ভার্য্যা তথৈব চ ।

যন্মিষ্মেব গৃহে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈষ্ণবং ॥

যে গৃহে পতি ভার্য্যার এবং ভার্য্যা পতির প্রতি সম্বৃত্ত, সে গৃহে নিশ্চয়ই নিত্য কল্যাণ হয় ।

অপত্যং ধর্ম্মকাৰ্য্যং শুশ্রূষা রতিক্তম্ভা ।

দারাদীন স্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ ॥ মহুঃ ।

লোকানস্থ্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ ।

তন্ম্যং সাধ্বাঃ স্ত্রিয়ঃ সেবা ভর্তব্যশ্চ স্বরক্ষিতাঃ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

সন্তান, ধর্মকার্য, শুশ্রূষা, সংপ্রভৃতি এবং আগমন ও পিতৃলোকের স্বর্গলাভ পত্নী হইতে হয়। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র হইতে অনন্ত স্বর্গলাভ হয়, অতএব সাধবী স্ত্রীদিগের সেবা, প্রতিপালন ও সুরক্ষণ কর্তব্য।

জিপ্সী বা বেদিয়া জাতি ।



বামাবোধিনীতে বেদিয়া বালিকা নামে যে একটি উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বেদিয়া নামক এক জাতির ব্যবসায় ও রীতি নীতি বর্ণিত হইয়াছে, এই বেদিয়াদিগকে ইউরোপে জিপ্সী বলে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহারা ইউরোপীয় কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহারা ইজিপ্ট বা মিসর দেশ নিবাসী, এই অনুমানে ইহাদিগকে 'জিপ্সী' বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কতকগুলি জিপ্সী ইজিপ্ট হইতে আসিয়াছিল যাত্র। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহারা আরো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে। জর্জনেরা ইহাদিগকে বিজ্ঞের বা ভ্রমণকারী, ওলন্দাজেরা হিদ্দেন বা পৌত্তলিক, দিনামার ও ফুইডেরা তাতারজাতি, ইটালীয়েরা বিজারী এবং হঙ্গেরীয়েরা 'ফোরার লোক' বলে। ইজিপ্ট হইতে আসিতে ইহাদিগকে জিপ্সী বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা ইজিপ্টের আদিম নিবাসী নহে। ইহাদিগের আকৃতি, আচার প্রণালী এবং ভাবা মিসর দেশীয় লোকদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই

জন্ম মিসর দেশের লোকেরাও স্বদেশে ইহাদিগকে বিদেশী বলিয়া জ্ঞান করে।

জিপ্সী জাতি যে ভারতবর্ষের লোক এবং ভারতবর্ষ হইতে অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, উহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু দেশীয়দিগের সহিত ইহাদিগের অনেক সৌম্যদৃষ্ট আছে, ইহারা সিন্ধু ভাষাতেও কথোপকথন করে। ইহাদিগের জাতীয় নকশীত মধ্যে হিন্দী কথা অনেক পাওয়া যায়। ইহাদিগের আচার ব্যবহার নীচজাতীয় সিন্ধুদিগের ন্যায় এবং তাহাদিগের ন্যায় ইহারা মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে।

জিপ্সীরা আপনারা আপনাদিগের আদি বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারে না, তদ্বিষয়ে তাহাদের কোন রুত্তান্তও লিখিত নাই। তাহাদিগের কোন বিশেষ ধর্ম নাই, খৃষ্টান বা মুসলমান যে জাতির মধ্যে বাস করে, তাহাদিগের বাহ্য ধর্মাদি সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের কতকগুলি জাতীয় লক্ষণ সর্বত্র দৃষ্ট হয়। সর্বত্রই তাহারা ভ্রমণাতুরাগী, নির্দিষ্ট বাসস্থান ভাল বাসে না, কৃষিকার্যে অনিচ্ছুক, আহারে অশুচি, মূর্খ, চুরি ও প্রতারণাপ্রিয়। তাহারা দণ্ড ভয়ে ডাকাইতি বা তাদৃশ অন্য ভয়ঙ্কর পাপাচুর্ভান করে না। অফ্রিকার রাজ্য যেরিয়া থেরিসা স্বরাজ্যের স্থায়ী প্রজা করিবার জন্ম ইহাদিগকে কৃষিকার্য শিক্ষা দিবার আদেশ করেন, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। হুদেদী এবং ট্রান্সালবেনিয়ায় কতকগুলি জিপ্সী বাসস্থাপন করিয়াছে এবং নদীর মৃত্তিকাহইতে স্বর্ণ সংগ্রহ, অথ বা অস্ত্রবিক্রয় ব্যবসায় করিয়া থাকে।

তৈমুর বেগ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখনি জিপ্সীরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া নানাদেশে ভ্রমণ আরম্ভ করে। ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগের প্রায় ১০০ ব্যক্তি পারিস নগরে আসিয়া তীর্থযাত্রী বা মিসর হইতে তাড়িত খৃষ্টান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। তাহারা ফ্রান্সে বাস করিবার অনুমতি পাইলে দলে দলে আসিতে লাগিল। ইহাদিগের শ্রুতবোধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌর্য্য কার্য করিয়া এবং জীলোকেরা ভাগ্যের ফলাফল গণনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদিগের অভ্যস্ত উপক্রমে ১৫২০ অব্দে ‘অর্ডিনান্স অব অর্লিয়ান্স’ নামক

এক আইন জারি হয়, তাহা দ্বারা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়, যাবতীয় প্রবঞ্চক ও লক্ষীছাড়া লোক দেশ হইতে দূরীভূত হইবে, নতুবা তাহাদিগকে জাহাজে খালাসীর কাজ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক জিপ্সী ফাঁস হইতে প্রাণত্যাগ করে। ইউরোপে সর্বশুদ্ধ প্রায় ৭।৮ লক্ষ জিপ্সী আছে। ইংলণ্ডে প্রবঞ্চকদিগের উপর আইনের কড়াকড়ি হওয়াতে ইহাদিগের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে।

জিপ্সীদিগের পুরুষেরা যেনন ধূর্ত ও প্রতারক, স্ত্রীলোকেরা ভক্তাধিক। ইহারা আপনাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং গণক ঠাকুরের নত স্ত্রীলোকদিগের নিকট বলিয়া তাহাদিগের ভাগ্যের ফলাফল বলিয়া থাকে। অবিবাহিতা রমণীগণের ইহাদিগের উপর অটল ভক্তি। নির্বোধ রমণীগণ বড় ঘরে বিবাহ হইবে কি না, স্বামীর বড় কর্ম হইবে কি না, এই সকল বিষয় গণাইতে চায় এবং যেমন দক্ষিণা দেওয়া হয়, তদনুসারে শুভাশুভ সংবাদ বলিয়া থাকে। কোন বাটিতে ইহাদিগের যাইবার বাধা নাই। কেবল ভাগ্য গণনাই ইহাদিগের উপার্জনের একমাত্র পথ নহে, এই উপলক্ষ করিয়া বাটী বাটী ভ্রমণ করে এবং যেখানে স্থযোগ পায় সেইখানে কাপড় ও অন্য জিনিষ পত্র অপহরণ করিয়া সরিয়া যায়।

শব্দ বিজ্ঞান।

আমরা ইতিপূর্বে শব্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিষয় লিখিয়াছি, (১) কিন্তু ইহা একটি প্রকাণ্ড শাস্ত্র, ইহার বিষয়ে জানিবার অনেক কথা আছে। শব্দ কি প্রকার পদার্থের মধ্য দিয়া চলিতে পারে এবং কিরূপে বেগে চলে, আজি আমরা সেই বিষয়ের বিবরণ লিখিব।

শব্দের মধ্য দিয়া শব্দ চলিতে পারে না অর্থাৎ যে পদার্থ আহত হইয়া শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে এবং কর্ণের মধ্যে যদি শূন্য থাকে, শব্দ কর্ণগোচর হয় না। সচরাচর আমরা যে শব্দ শুনিতে পাই, তাহা বায়ুর মধ্য দিয়া আসিয়া থাকে, এই জন্য বায়ুকে শব্দের বাহক বা শব্দবহু বলে। বায়ুশূন্য স্থলে কোন শব্দই শুনা যায় না। বায়ু নির্গমন যন্ত্রের (Receiver) আধার যখন বায়ু পূর্ণ থাকে, তখন তাহার মধ্যে একটি ঘটা বাজিলে স্থল্পষ্ট

শুনা যাইবে, কিন্তু তাহা হইতে বায়ু যত বাহির হয়, ঘণ্টার শব্দ ততই মৃদু এবং অস্পষ্ট হয়, শেষে আর কিছুই শুনা যায় না। বায়ু প্রধান শব্দ-বাহক বটে, কিন্তু একমাত্র শব্দবহন নহে। জলীয় ধূম, সর্বপ্রকার বাষ্প, তরল পদার্থ এবং ঘন পদার্থও অস্পষ্ট শব্দ বহন করিয়া থাকে। বায়ু নির্ধান যন্ত্রের আধার বায়ু শূন্য করিয়া যদি কোন প্রকার বাষ্প পূর্ণ করা যায়, তাহাহইলেও ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট শুনা যাইবে। তরল পদার্থের মধ্য দিয়া যে শব্দের বহনাবহন হয়, জল তাহার একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জলের ভিতরে দুই বস্তু পরস্পর আঘাত হইলে তাহার শব্দ শুনা যায়। ডুবুরীরা জলের নীচে নামিয়া তীরস্থ লোকদিগের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনিতে পায়। এক পুঙ্খনিপাত এক ধারে হস্ত কি পদ দ্বারা জলের ভিতর কোন শব্দ করিলে অন্যধারে এক ব্যক্তি ডুব দিয়া তাহা শুনিতে পায়। ঘন পদার্থের মধ্য দিয়াও শব্দের গতি হয়। এক খণ্ড কাঠের এক প্রান্তে পেন কলম দিয়া অস্পষ্ট অস্পষ্ট আঁচড়াইলে অপর প্রান্তে কান পাতিয়া তাহা শুনা যায়। নিম্নকৃত রজনীতে ভূমির উপরে কণ দিয়া দূরে ঘোটকাদির আগমন নিরূপণ করা যায়। রেলওয়ের দৌহের উপর কণ পাতিয়া দূর হইতে ট্রেন আসিতেছে কি না, বলিতে পারা যায়।

শব্দের উচ্চতা ও মৃদুতার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) যত দূর হইতে শব্দ আইসে, সেই পরিমাণে তাহা মৃদু হয় এবং যত নিকট হইতে আইসে, সেই পরিমাণে উচ্চ হয়। এ বিষয়ের নিয়ম এই, কণ হইতে শব্দায়মান বস্তুর যত দূরত্ব, তাহার বর্গ * করিয়া লইলে শব্দের মৃদুতা নিরূপিত হয় অর্থাৎ দ্বিগুণ দূর হইতে শব্দ সিকি শুনা যায়, ৩ গুণ দূর হইতে ৯ ভাগের এক এক ভাগ, ৪ গুণ দূর হইতে ১৬ ভাগের ১ ভাগ ইত্যাদি। ২০ হাত অন্তরে ৪ টা ঘণ্টা বাজাইলে যেরূপ শব্দ হয়, ১০ হাত অন্তরে ঠিক সেটরূপ ১টা ঘণ্টা বাজাইলে সেইরূপে শব্দ শুনা যায়।

(২) শব্দায়মান বস্তুর কম্পন যত বৃদ্ধি হয়, শব্দ তত উচ্চ হয়।

* কোন অঙ্কে সেই অঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে তাহার বর্গ হয়, যেমন ২ র বর্গ (দুই দুগুণে চারি) $২+২=৪$, ৩র বর্গ $৩+৩=৯$ ইত্যাদি।

এারে অধিক কম্পন হইলে তাহা চক্ষুতে দেখা যায়, কর্ণে অধিক শুনা যাইবে আশ্চর্য্য কি ?

(৩) যে বায়ুর মধ্যে শব্দ হয়, সেই বায়ু যত ঘন হয়, শব্দ তত উচ্চ হয়। বায়ু নির্খান যন্ত্রের আধারে বায়ু যত শুষ্ক হয়, শব্দ তত ক্ষীণ হয়, পূর্বের বলী গিয়াছে। জলজন বাষ্প বায়ু অপেক্ষা প্রায় ১৩ ভাগ লঘু, এই জন্য ইহার ভিতরে শব্দ অতি মৃদু। অঙ্গারক বাষ্প বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী, তাহার মধ্যে শব্দও গম্ভীরতর। পর্বতের উপরের বায়ু অত্যন্ত লঘু, সেখানে চিৎকার করিয়া কোন কথা না বলিলে অন্তে শুনিতে পায় না। সেখানে কামানের আওয়াজ করিলে পটকার শব্দের মত বোধ হয়।

(৪) বায়ুর চলাচল এলং দিক পরিবর্তন দ্বারা শব্দের স্থানাতিরেক হয়। দ্বির আকাশে শব্দ যেমন চলে, বায়ু বহিলে সেরূপ হয় না। বায়ু যে দিকে বয়, সেই দিকে শব্দ উচ্চ হয়, অপরদিকে মৃদু হয়। দক্ষিণ বায়ু জোরে বহিলে দক্ষিণের অঙ্গ শব্দও উত্তরে শুনা যাইবে, কিন্তু উত্তরের উচ্চ শব্দও হয় ত দক্ষিণে আসিবে না।

(৫) শব্দ প্রবণ বস্তুর সহিত সংলগ্ন থাকিলে শব্দ উচ্চ হয়। তুঘুরের তার স্বতন্ত্র লইয়া বাতাসে অঙ্গুলি দিয়া সঞ্চালন করিলে সামান্য শব্দ হয়। কিন্তু তুঘুরার খোলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিলে শব্দ বড় উচ্চ হয়। তারের কম্পনের সঙ্গে খোলও তন্মধ্যস্থ বায়ুর ও কম্পন হয়, এই জন্য তার যুক্ত বাজ যন্ত্র সকল বাক্স বা খোলে সংযুক্ত থাকে।

নলাকার বস্তুর মধ্যে দিয়া শব্দ দূরদেশে গেলেও কমিয়া যায় না। প্যারিস নগরের ২০৮০ হাত দীর্ঘ এক জলের পাইপের এক ধারে ছোট ছোট করিয়া কথা বলিলে অন্য ধারে কান পাতিয়া শুনা যাইত। ইংলণ্ডে যে বাগ্‌যন্ত্র দিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে কথাবার্তা চলিত, তাহা নলদ্বারা সম্পন্ন হইত। এক নগর হইতে নগরান্তরে এইরূপ নলদ্বারা কথোপকথন করা যায়। শব্দ প্রতি সেকণ্ডে ১১১৫ ফিট বা ৬৪২ হাত যায়, ২৫ জোশ দূরবর্তী স্থানে নলের ভিতর দিয়া শব্দ যাইতে ৪ মিনিট মাত্র বিলম্ব হয়।

ডাকারেরা ক্লেথিস্কোপ নামে যে এক প্রকার যন্ত্রের উপর কান দিয়া রোগ পরীক্ষা করেন, তাহাও এই কৌশলে নির্মিত । প্রায় ১ ফুট দীর্ঘ ও ১/২ বুর্লন প্রস্থ একটা শক্ত কাষ্ঠের নলের দুই ধারে প্রশস্ত করা হয়, একধারের উপর কান দিয়া রোগীর বক্ষে এই যন্ত্র রাখিয়া তাহার ভিতরে ক্ষত আছে কি না একপ্রকার শব্দ শুনিয়া নিরূপণ করা যায় ।

শব্দের বেগ—শব্দ বায়ু তরঙ্গ উৎপাদন করিতে করিতে চলিতে থাকে, এই জন্য তাহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় । আলোকের গতি ইহা অপেক্ষা অনেক দ্রুততর । আকাশ হইতে বিদ্যুৎ ও মেঘের ডাক এক সঙ্গে হয়, কিন্তু আমরা প্রথমে বিদ্যুৎ দেখি, পরে মেঘের ডাক শুনিতে পাই । আলোক প্রকাশ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিঃকটে পৌঁছিল, কিন্তু শব্দের আসিতে বিলম্ব পড়িয়া যায় । শব্দের গতির নিয়ম অবধারণার্থে পণ্ডিতগণ অনেক দিনাবধি চেষ্টা করেন । ১৮২২ সালে পারিসের এক সভা পারিসের মণ্টলহারী এবং বিলিজুইফ নামক দুই উচ্চস্থান মনোনীত করেন । উভয় স্থান হইতে কামান ছোড়া হয় এবং উভয়স্থানের লোকেরা আলোকদর্শন ও শব্দ বেগের মধ্যোক্ত বিলম্ব হয়, তাহা নিরূপণ করে । ইহাতে প্রতি সেকেন্ডে ১১১৫ ফিট শব্দের গতি নিরূপিত হয় ।

বায়ুর উত্তাপের পরিমাণ বহু ভ্রাস হয়, শব্দ তত মৃদু গতিতে চলে । ১৬ ডিগ্রী উত্তাপে ১১১৫ ফিট, ১০ ডিগ্রী উত্তাপে ১১০৬, শূন্য ডিগ্রী উত্তাপে ১০৯০ ফিট এই পরিমাণে কমিয়া যায় । ১০ ডিগ্রী উত্তাপে অদ্বারক দ্রাবকে ৮৫৭, অল্পজন বাষ্পে ১০৪০ এবং জলজনে ৪১৫৪ ফিট হয় । জলের মধ্যে শব্দের গতি বায়ু অপেক্ষা প্রায় ৪ গুণ দ্রুততর, কাঠ বিশেষে প্রায় ১৬ গুণ, ধাতু সকলের মধ্যে শব্দ ৪ হইতে ১৬ গুণ দ্রুতবেগে চালিত হয় ।

শ্রবণ ।

শ্রবণ অদৃশ্য জাতীয়, বর্ণধারী ও পিপীলিকাজুক শ্রেণীর । ইহারা অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলে, এই জন্য ইহাদিগকে শ্রবণ বলে । এরূপ কথিত আছে, একটি বৃক্ষের তলদেশে ইহাতে অগ্রভাগে উঠিতে ইহাদিগের এক মাস কাল বিলম্ব হয় ।

এটি ঠিক বোধ হয় না। ভূমিতে ইহারা অত্যন্ত অস্তে অস্তে চলে, কিন্তু বৃক্ষের শাখা ধরিয়া অবলীলাক্রমে দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। একটি সাহেব আমেরিকায় ভ্রমণ করিতে গিয়া এক নদীর তীরে এক স্নাত্তকে দেখিয়াছিলেন। তীরের নিকটেই বৃক্ষ ছিল, কিন্তু সাহেব ছুটিয়া গিয়া স্নাত্তটিকে ধরিলেন, সে কোনমতে গাছের নিকট পৌঁছিতে পারিল না। পরে সাহেব দূর করিয়া তাহাকে একটি গাছের নিকট ছাড়িয়া দিলেন। সেখানে ক্রমাগত বৃক্ষশ্রেণী নিবিড় অরণ্য হইয়া ছিল। স্নাত্ত বৃক্ষের একটি ডালে স্থানিয়া ক্রমে গাছের আগডালে উঠিল, পরে আর একটী, তৎপরে আর একটী গাছ ধরিয়া এইরূপ করিয়া চলিয়া গেল, শেষে সে নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হইল, সাহেব আর দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে স্নাত্তেরা বৃক্ষের উপরে দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারে। তবে ইহারা অলস প্রকৃতি। সন্দিগ্ধ গাছের ডালে স্থানিয়া থাকে, চলিবার সময় নোজা হইয়া উঠিয়া চলে না, স্থানিয়া স্থানিয়াই চলিয়া থাকে। আমরা বানরদিগকে শাখামুগ বলিয়া থাকি, কিন্তু স্নাত্তেরাই বাস্তবিক শাখামুগ। ইহারা দৈব ঘটনা ভিন্ন ইচ্ছা পূর্বক কখন শাখা পর্ষা ত্যাগ করে না।



স্নাত্তদিগের মাথা গোলাকার এবং ক্ষুদ্র, ইহাদিগের কানের দাঁত এবং খাদ্য আছে, কেবল সমুদ্রের দন্ত নাই। ইহাদিগের হস্ত পদের গঠন সমুদ্রায় চতুষ্পদ জন্তু হইতে বিভিন্ন। ইহাদিগের হস্ত শু বাহ একত্র করিয়া

ধরিলে পদ ও উক অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। ইহারা পার উপর ভর দিয়া মোজা হইয়া দাঁড়াইলে হাতের অঙ্গুলি ভূমিতে ঠেকিবে। এই কারণে ভূমির উপর চলিতে গেলে ইহাদিগের হাত ভূমুড়াইয়া কুহুইয়ের উপর ভর দিয়া চলিতে হয়। বানরদিগের হাত লম্বা, কিন্তু তাহাদিগের অঙ্গুলি সকল পৃথক ২, এবং বুদ্ধাঙ্গুলি অমান্য অঙ্গুলির বিপরীত। ইহাদিগের যে কয়েকটা অঙ্গুলি, বালাকাল হইতে একত্র যুক্তিয়া কঠিন হইয়া থাকে। অঙ্গুলি সকল হইতে স্বদীর্ঘ বক্রাকার নখ বহির্গত হয়, তাহাই কেবল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাদিগের কুহুইয়ের সঙ্গে যে হাতের হাড় সংযুক্ত, তাহাও ঠিক সরলভাবে প্রসারিত নহে, বক্র হইয়া ছুই হাত কাছাকাছি হইয়া থাকে। ইহাদিগের পা অপেক্ষা পার নখও অধিক দীর্ঘ এবং তাহা ভিতর দিকে মোড়া। বিড়ালদিগের নখ বাহির হইয়া আছে, ইচ্ছা হইলে তাহারা তাহা সঙ্কুচিত করিয়া লুকাইতে পারে। ইহাদিগের তাহার বিপরীত, ইহাদিগকে কষ্ট করিয়া নখ খেলাইতে হয়। ইহাদিগের পাছা আবার এমনতরো গঠিত এবং পার হাড়ের সহিত এ প্রকারে সংলগ্ন, যে তাহা খেলিতে পারে না। এই সকল কারণে দুখ বাছুড়ের মত ভূমির উপর ভাল করিয়া দাঁড়াইতে এবং চলিতে অসমর্থ। এই কারণে ইহাদিগকে স্থিতির মধ্যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জীব বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কুহুইর নামক প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিদ বলেন অন্যান্য জন্তুর সহিত তুলনা করিলে শূন্য এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন কালের জীব বলিয়া প্রবীত হয়; ইহা যেন বর্তমান পৃথিবীর উপযোগী নহে এবং কোন অলৌকিক কৌশলে পূর্বগত জীবজগতের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ইহার বৃত্তান্ত অধিক অবগত হইয়া সে ভ্রম দূর হইয়াছে। মহা অজ্ঞানতাবশতঃ যে কার্যকে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করেন, বস্তুতঃ তাহাতেই সৃষ্টিকর্তার অধিকতর কৌশল ও মঙ্গলানুপ্রায় নিহিত আছে, আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। শ্রুত ভূমিতে ভ্রমণ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহা হইলে ইহার দুর্ভাগ্যের পরিসীমা থাকিত না। অগদাখর ইহাকে যাবজ্জীবন রক্ষণেরি বাস ও বিচরণ করিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, এবং সম্পূর্ণ তদুপযোগী করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কেমন কৌশলে রচনা করিয়াছেন,

এ বিষয় যত আলোচনা করা যায় ততই এই জীবের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা উপলব্ধি করিয়া বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় ।

প্রথমে পল অপেক্ষা হস্তের অধিকতর দৈর্ঘ্য, অঙ্গুলি সকলের দৃঢ়বদ্ধতা, হস্ত পদের হাড়ের বক্রতা, নখ সকলের গঠন বিপর্যায় এবং মনুবার অপেক্ষা কঠিনতা প্রযুক্ত ভূমির উপর দিয়া অথবা সোজা হইয়া চলা ইহার পক্ষে যেমন কষ্টকর, ডালের উল্টা দিকে ঝুলিয়া ঝুলিয়া চলা তেমনই সহজ । ওয়া-টন নামক এক সাহেব দক্ষিণ আমেরিকাতে ভ্রমণ করিয়া এই জন্তর বৃত্তান্ত বিশেষরূপে আলোচনা করেন এবং ইহার সম্বন্ধে লোকদিগের অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন । তিনি বলেন ইহার ডালে ঝুলিয়া চলে, ডালে ঝুলিয়া আহার করে, ডালে ঝুলিয়া নিদ্রা যায়, তাহাতে কিছু মাত্র কষ্ট পায় না, প্রত্যুত পরম আরাম অনুভব করিয়া থাকে । আমেরিকার আদিম নিবাসীরা বলে, যখন বাতাস বয়, তখন জাথেরা চলিতে থাকে । বস্তুতঃ যখন বায়ু স্থির থাকে, তখন পাছে ভঙ্গপ্রবণ কোন শাখা ধরিয়া পড়িয়া যায়, এই জন্ত জাথ বড় অধিক নড়ে না, কিন্তু বাতাসে ব্লফ সকলের শাখা যখন পরস্পরের গায় আঘিয়া পড়ে, সে তখন আশ্চর্য্য দৃশ্যের সহিত চলিয়া থাকে । তখন সে যেমন নহে ব্লফ হইতে বৃক্ষান্তরে চলিতে থাকে, তাহা দেখিলে তাহাকে 'ব্লফ' নামে কখনই অভিহিত করা যায় না ।

জাথের কেবল হস্তপদের গঠন অন্যান্য চতুষ্পদ হইতে বিভিন্ন নহে, ইহার অন্যান্য অঙ্গ বচনারও টেবলফ্যা দৃষ্ট হয় । ইহার পাকস্থলী ৪টা ভাগে বিভক্ত এবং কতকটা রোমন্থক জন্তর পাকস্থলীর ন্যায় । কিন্তু ইহা গোক বা ভেড়া স্থায় রোমন্থন করে না । রোমন্থক জন্তুদিগের পাকনালী তাহাদিগের শরীর অপেক্ষা প্রায় ১০ গুণ দীর্ঘ, জাথের দ্বিগুণ হয় কি না সম্ভবতঃ ন । সম্পূর্ণ নিরামিষভোজীর পাকনালীর এরূপ বর্ধিতা অসম্ভব আশ্চর্য্য । কিন্তু পাকনালী ক্ষুদ্র হউক, তাহার ভিতর অনেক জটিলতা ও কারীকরী আছে, এই জন্ত আহার অনেককাল তাহাতে থাকিয়া ও পোষিত হইয়া জীর্ণ হয় । জন্তুপায়ী জন্তু মাত্রেই বাড়ে ৭ খানি ছাড় আছে । ভিগি ও হাঙ্গরের গ্রীবা যে এত ক্ষুদ্র এবং উষ্ট্র ও জিরাফির গ্রীবা যে এত অদীর্ঘ, তথাপি তাহাদিগের পক্ষে এ নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায় ।

না। কিন্তু প্রাণের গ্রীবাঙ্গি ৯ খানি। ইহা দ্বারা ইহার ঘাড়ের আকার দীর্ঘ হয় না, কিন্তু গাছে ঝুলিয়া থাকিবার সাহায্য হয় এবং যখন খাবার করে, এক হস্তে ডাল ধরিয়া অপর হস্তে সুখে পত্র ভোজন করিতে পারে।

প্রাণের দশের গঠনে কিছু আশ্চর্য আছে। ইহার মস্তিষ্কের দন্ত নাই। খাদ্য শুধি অত্যন্ত ছোট। কনের দাঁত উপর পাটিতে ৮ এবং নীচের পাটিতে ৬ টি করিয়া সজ্জিত। কনের দাঁতের অগ্রভাগে গর্ভ আছে, শুদ্ধারা কঠিন জ্বোর চর্কণ কার্যে উত্তমরূপে নির্বাহিত হয় না। কিন্তু ইহার যেরূপ পাকস্থলী আছে, তাহা দ্বারা দস্তের অত্যধিক হইয়া যায়।

প্রাণেরা অত্যন্ত চতুঃপদের জায় সম্মান প্রাপ্য করে এবং সম্মানকে স্তম্ভ পান করিয়া থাকে। ইহাদিগের এককালে একটা শাবক হয়। মাতার বক্ষে দুইটা স্তন থাকে, প্রাণ শাবক জন্মিবামাত্র মাতার শরীর জড়াইয়া থাকে, যে পর্যন্ত বড় এবং আত্মপোষণক্ষম না হয়, মাতাকে পরিত্যাগ করে না। প্রাণের মাথা আমেরিকার বানরের ন্যায় ছোট ও গোলাকার। কান দুটা, লম্বা লম্বা লোমের আবৃত। চক্ষু ক্ষুদ্র এবং কোটরে প্রবিষ্ট। লালু লালু নাই বলিলেই হয়। প্রাণ দক্ষিণ আমেরিকায় নিবিড় অরণ্যে বাস করে। আদিম নিবাসীরা ইহার মাংস বড় ভালবাসে এবং সেই জন্য সর্বদাই ইহার শিকারের পন্থায় ভ্রমণ করে। প্রাণেরা যখন অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করে, তখন 'আই' বলিয়া একপ্রকার শব্দ করে, এই জন্য ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে 'আই' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহাদিগের জীবন সহজে বিনষ্ট হয় না। জ্বর ও অন্য যন্ত্র শরীর হইতে স্থানান্তরিত করিলেও আধঘণ্টা কাল জীবনের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মিগাথ্রিয়াম নামক এক প্রকার কস্তুর বর্ণনা করেন, সে জাতি পৃথিবী হইতে এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের যে অস্থিময় কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, প্রাণের সঙ্গে তাহার অত্যন্ত সৌম্যদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের আকার হস্তী অপেক্ষাও বৃহৎ। জনেকে অনুমান করেন, মহাবোর আগমনের পূর্বে ইহারা পৃথিবীতে জীবজন্তু ছিল। ইহাদিগের এত শক্তি ছিল, যে এক একটা

গাছের গোড়া নব দিয়া বুলিয়া উৎপাটন করিয়া ফেলিত। ইহাদিগের সহিত পরাক্রমে বোধ হয় কোন ক্ষুদ্র আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

সমুদ্র গঙ্গা।

নদী সকল পরিত হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, ইহাই সকলে জানে, কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া একটী নদী বহনাবহন হয়, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। এই নদীর জুই তীর সমুদ্রের তল জল, ইহার তলভাগে সমুদ্রের শীতল জল দ্বারা সংগঠিত। নিতাই ইহা স্বয়ং উষ্ণ জলে পরিপূর্ণ। এই জন্য ইহাকে উষ্ণ জল স্রোত বলে, আমরা ইহার নাম সমুদ্রে গঙ্গা রাখিলাম। এই নদী যেক্ষ প্রদেশ এবং সমুদ্রের উষ্ণ প্রধান দেশের মধ্যে সর্বদা বহনাবহন করিতেছে। অত্যন্ত গ্রীষ্মে ইহার জল শুষ্ক হয় না, অত্যন্ত বর্ষায়ও উৎলিয়া জলপ্রাধান উৎপাদন করে না। ইহা গঙ্গা, আমেজন, মিসিসিপি প্রভৃতি নদী অপেক্ষাও প্রবলতর বেগে বহমান হয় এবং সে সকল নদী অপেক্ষা ইহার জলরাশি পরিমাণে সহস্র গুণ অধিক। ইহা দ্বারা উষ্ণদেশের জল শীতল এবং শীত প্রধান দেশের জল উষ্ণ হইয়া থাকে।

ভূমির স্থায় সমুদ্রেরও শৈত্য ও উষ্ণতার সূচনাধিক্য আছে। বিশ্ব রেখার নিকট অধিক উষ্ণতা, উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু ভূমি যত উষ্ণ হয় তত শীতল, সমুদ্রে যত গভীর হয় তত শীতল। ভূমির উপর বায়ু প্রবাহ শীতোষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি করে, সমুদ্রের ভিতর জলপ্রবাহ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভূতর জন্তুদিগের স্থায় জলচর জন্তুরাও শীতোষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকে। যে সর্বশক্তিমান ইন্দ্ৰিয় স্থলপদ্মকে সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র বাবুই পক্ষীর তত্ত্বাবধান করেন, তিনিই মুক্তা রচনা করিয়াছেন এবং প্রকাণ্ড দেহ তিনি মৎস্যের জীবন রক্ষা করেন। তিনি প্রত্যেক উদ্ভিদ ও জীবের জীবন ধারণোপযোগী অবস্থা সংঘটন করিয়া থাকেন। ভূতল-বাসীরা যেমন তাঁহার প্রজ্ঞা ও তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া তাঁহার ইচ্ছা

সম্পাদন করে, সমুদ্রতল বাসীরও সেইরূপ। অতএব সমুদ্রে কেবল জলজীবী জলবাসী মনে করা আমাদের ভ্রম। ভূমির উপর যেমন অশুষ্কতা ও সৃষ্টি কৌশল বিজ্ঞান, জলের মধ্যেও সেইরূপ তাহা বিজ্ঞান রহিয়াছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থল উষ্ণ কটিবন্ধে স্থাপিত, সেই স্থানের জল পৃথিবীর উত্তাপে অধিক তপ্ত হইয়া একটি প্রবাহের আকারে ধাবমান হয় এবং ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমস্থ দেশ সকলের নিকট দিয়া অনেক দূরের দিকে প্রবাহিত হয়। এই উষ্ণ জল প্রবাহকে আমরা সমুদ্র গঙ্গা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ইহা দ্বারা ইংলণ্ড প্রভৃতির শীতাতপ অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। সমুদ্রের ভিতরে যে এইরূপ নদী স্রোত আছে, ইহা প্রথমে জলচর জীবদিগের গতি দেখিয়া নিরূপিত হয়। তিনি প্রভৃতি জন্তু শীতল জলে বিহার করে, প্রাণান্তে উষ্ণ জলস্রোতে যায় না। কিন্তু কড়ী প্রবালকীট প্রভৃতি কতকগুলি জীব উষ্ণস্রোতই ভাল বাসে। এক আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরে প্রায়মাত্র এবং পূর্বতীরে শেষোক্ত জন্তু সকল প্রায় বরাবর দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের স্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যায় না। ইহা বরিয়া অহুসঙ্কান করিয়া লোকে জানিতে পারিল, আটলান্টিকের একদিকে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত এবং তাহার বিপরীতে উষ্ণের কেন্দ্র হইতে একটি শীতল জলস্রোত নিগত বহমান হইতেছে।

শীতকালে ইউনাইটেড স্টেটসের উত্তর তীরে তাপঞ্জ লইয়া আসা যে রূপ কঠিন ও বিপদজনক পৃথিবীর আর কোন স্থানেই সেরূপ নহে। সমুদ্র গঙ্গা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে শীতকালে ইউরোপ হইতে নিউ ইংলণ্ড, নিউইয়র্ক অথবা ডেলাওয়ার ও চেসাপিক অস্থরীপে উপস্থিত হওয়া নিত্যস্থ চুঃসাধ্য ছিল। এই পথে জাহাজ চলিতে চলিতে এরূপ ভয়ঙ্কর বরফের বড় স্রুটির মধ্যে পতিত হইত, যে নাবিকগণ তাহাদিগের যতদূর সাধা বল ও কৌশল প্রকাশ করিয়াও কিছুই করিতে পারিত না। সেই পথে চলিলে অস্পন্দনের মধ্যে জাহাজ কেবল বরফরাশি বলিয়া বোধ হয়। জাহাজস্থ লোক সকল শীতে অবশদেহ ও নিকপায় হইয়া পড়ে—জাহাজ

কেবল তালের দ্বারা নির্দিষ্ট দিকে চালিত হয়। কয়েক ঘণ্টা চলিয়া সমুদ্র গভীর ধারে আসে এবং ঘোরতর শীত হইতে এককালে গ্রীষ্ম সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয়। সেখানে বরফ গলিয়া জাহাজের গাজ পরিষ্কৃত হয় এবং নাবিকগণ উকজলে স্নান করিয়া লয়। কিয়ৎকণ চলিয়া জাহাজ পুনরায় শীতল জলস্রোতে পতিত হয় এবং পূর্বের মত ছুরবস্থা ভোগ করে। বহুদিনের ক্রোশ ও কষ্টভোগের পর লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়। কিন্তু সমুদ্র ও শীতের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে গিয়া অনেককে সমুদ্রগর্ভেই চিরকালের মত শয়ন করিতে হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলে স্থল অপেক্ষা জলের পরিমাণ অধিক। এই জল উত্তপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বাষ্প হইয়া যায়। এত অধিক জল বাষ্প হইয়া গেলে সমুদ্রের মধ্যে একটা শূন্যতা বা ফাঁক পড়িয়া যায়, এই শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য স্রোত কেন্দ্র হইতে বধন শীতল জলস্রোত আইসে, তাহা প্রায় ঠিক সরলভাবে বিষুব রেখার দিকে যাইতে থাকে, কিন্তু অধিক দূর যাইতে না যাইতে পৃথিবীর আকর্ষিক গতিদ্বারা বক্র হইয়া যায়। কেন্দ্রের নিকট পৃথিবীর গতি কিছুই নাই, এই জন্য সেখানে জলস্রোত ঘূর্ণমান হয় না। যত বিষুব রেখার দিকে যাইতে থাকে, ততই পৃথিবীর গতিদ্বারা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে চালিত হয়। বিষুব রেখার নিকট পৃথিবী ঘণ্টায় ১০০০ মাইল ঘূর্ণায়মান হয়, কেন্দ্র হইতে যে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা গ্রীষ্মমণ্ডলের সীমার নিকট আসিয়া পশ্চাতে পড়ে। গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে বর্তী সমুদ্র পৃথিবীর দ্রুতগতিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরে। শীতল জলস্রোত মন্দগতিতে আসিয়া মদ্র ধরিতে পারে না, এই জন্য পশ্চাতে পড়িয়া যায় এবং পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই কারণে বিষুব রেখার উত্তর দিকে জল রাশি প্রায় ৩০০০ মাইল প্রাপ্ত স্রোতরূপে পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে বহমান হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে নিত্য বায়ু এক দিকে নিয়তকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দ্বারা এই জলস্রোত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০।১১ মাইল গতি প্রাপ্ত হয়।

ভূমির প্রতিবন্ধক না পাইলে সমুদ্রের জল চিরকাল একদিকেই বহিত।

ভূমির ব্যবধান থাকিতে যে জলস্রোতে পশ্চিমাত্মিস্থ হইয়া চলে, তাহা আবার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তর বা দক্ষিণমুখী হইয়া যায়।

আটলান্টিকের গ্রীষ্মমণ্ডলে যে স্রোত বয়, তাহার প্রধান শাখা দক্ষিণ আমেরিকার সেন্ট রোক অন্তরীপ হইতে উত্তর পশ্চিমাত্মিস্থে গিয়াছে। ইহা ব্রেজিলের উপকূল দিয়া ক্যারিবিয়া সাগরের মধ্য দিয়া মেক্সিকো উপসাগরের চারিদিক ঘেঁষেইন করিয়া ফ্লরিডা এবং কিউবার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে এবং উত্তর আটলান্টিকে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্র গঙ্গা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্র স্রোত সকলের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা হৃদয়।

ফ্লরিডা প্রণালী মধ্যে সমুদ্র গঙ্গা ৩২ মাইল প্রশস্ত, ২২০.০০ ফিট গভীর এবং ঘণ্টায় ৪ মাইল যায়। ক্যারোলিনার তীর পর্যন্ত ইহার জল বিশুদ্ধ নীলবর্ণ। সমুদ্রের জল এবং ইহা একরূপ স্বতন্ত্র যে তথায় একতানি জাহাজ চলিলে কোন জলের মধ্যে তাহার কত অংশ পড়িয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। সমুদ্র গঙ্গার উপরিভাগের জল সর্বাপেক্ষা উষ্ণ এবং তাহার নিম্ন দেশে ক্রমশঃ যত হাওয়া যায়, উষ্ণতা তত কম অনুভূত হয়। অবশেষে তলা সম্পূর্ণ শীতল। উষ্ণস্রোত সমুদ্রতলে কখনই দৃষ্ট হয় না। উষ্ণস্রোত এবং সমুদ্রতলের মৃত্তিকার মধ্যে শীতল জলের একটা স্তর সর্বত্র বিদ্যমান দেখা যায়। এই ব্যবস্থাটী অতি চমৎকার। মেক্সিকো উপসাগর অত্যন্ত উত্তপ্ত সমুদ্রস্বরূপ। তাহার তাপ আটলান্টিকের অপর পারে চালিত না হইলে নিত্যই অসহ্য হইত, এই তাপ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং ইউরোপের পশ্চিমমাংশে চালিত হইয়া আবার তাহাদিগের শীতংশ হ্রাস করে। শীতল জল তাপের পরিচালক নহে, কিন্তু সমুদ্র তলস্থ মৃত্তিকা তাপের পরিচালক, যদি নিম্নে শীতল জলের স্তর না থাকিত, তাহাহইলে তাপ ঐ মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট হইত এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তাহা হইলে লাব্রাডোরের স্থায়ী অত্যন্ত শীত প্রধান এবং চির নিহার পূর্ণ হইয়া থাকিত। শীতকালে আটলান্টিক মহা-সাগরে সমুদ্র গঙ্গাদ্বারা যে উত্তাপ পরিচালিত হয়, তাহা এত উষ্ণ যে ফ্রান্স ও ব্রিটিশ দ্বীপ পুঞ্জের উপরিস্থ বায়ুবাণি বরফ জমিবার মত শীতল হইলেও গ্রীষ্মের তাপে অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে। পশ্চিম দিকে মত বায়ু প্রবাহ বয়, তদ্বারা এই তাপ ইউরোপে সঞ্চারিত হইয়া উত্তরীয় শীতল

বায়ুর প্রভাব বিনষ্ট করে। এই ক্ষমতা লাভার ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এক অঙ্গাংশে স্থাপিত হইলেও উভয়ের অবস্থা অত্যন্ত বিভিন্ন দেখা যায়।

সমুদ্র গঙ্গা যত চলিতে থাকে, ততই প্রশস্ত হইয়া যায়। ইহা উত্তর আমেরিকার উপকূল হইতে নিউ ফাউন্ডল্যাণ্ডে যায়, তাহা হইতে পূর্ব দিকে ফিরিয়া একটা শাখা ব্রিটিশ দ্বীপ, নরওয়ে ও উত্তর হিমসাগরের দিকে যায়। অপর শাখা আর্জেন্টাইন দ্বীপপুঞ্জে গিয়া দক্ষিণাভিমুখী হয় এবং আফ্রিকার দ্বার দিয়া ব্রহ্ম গ্রীষ্মকালের অগরাশির সহিত মিলিত হয়। আর্জেন্টাইন, আর্জেন্টাইন এবং কানাডা ও কেপ ডি ভার্ডের মধ্যে একটা ব্রহ্ম জল ভাগ ইহার সংস্পর্শ শূন্য হইয়া স্থির ভাষাপন্ন থাকে। এই স্থানটিকে সারাগোসা বা তুণসাগর বলে, ইহা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা অধিকতর স্থান মুড়িয়া আছে। ইহা সামুদ্রিক উদ্ভিদে জাহাজের গতি অনেকটা রোধ করে। একটু দূর হইতে ইহা ভূমির ন্যায় দেখায়। কলম্বাসের সন্নিগণ ইহা দেখিয়া পৃথিবীর শেষ সীমা মনে করে এবং ভয়াক্রান্ত হয়। সমুদ্র গঙ্গার ধারে ধারে এক এক ব্রহ্ম তুণ রাশি ভাসিতে দেখা যায়। এক পাত্র জলে তুণ রাশিয়া যদি জলটা বুঝায় দেখা যায়, পাত্রের মধ্যস্থলে গতি কম হইয়া লঘু বস্তু সকল সেই খানে জমে, আটলান্টিক মহাসাগরে সমুদ্র-গঙ্গা সেইরূপ ঘূর্ণায়মান জল এবং তুণসাগর তাহার স্থির কেন্দ্র। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের সময় সর্বপ্রথম ইহা দর্শন করেন। ইহা অত্যাশি সেই স্থলে আছে, ঋতুভেদ স্বচিকি ও বায়ু প্রবাহ দ্বারা কিছু কিছু সরিয়া যায়। গত ৫০ বৎসরের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় ইহার নীমা ও পরিমাণ প্রায় সমান অবস্থায় রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তার।

ইংরাজেরা জাহাঙ্গির বাদশাহের সময়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজদিগকে বোম্বাই সাম্রাজ্যের মধ্যে ৪ টি কুঠি স্থাপন করিবার আদেশ দেন। ইংরাজেরা স্বরাটে সর্বপ্রথমে

কুঠি করেন এবং তৎপরে মগধিগন ও কালিকটেও বাগিজোর কুঠি খুলিয়া বসেন। এই সময়ে বাগদৌপের মধ্যে বাগদৌপ নামক নগরই ইংরাজদিগের বাগিজোর প্রধান আড়তা ছিল, ভারতবর্ষের কুঠি সকল তাহারই অধীন।

১৬৩৮ অব্দে বাউটন নামে সুরাটস্থ এক জন ইংরাজ সম্রাট সাজিহানের কন্যার পীড়া আরোগ্য করেন, তাহাতে ইংরাজ বাগিজোর উন্নতির জন্য সম্রাটের নিকট হইতে অনেক অর্থগ্রহ লাভ করেন। তিনি চিকিৎসা নৈপুণ্যের দ্বারা বঙ্গদেশের নবাবেরও কৃপা লাভ করেন। ইংরাজের আপনাত্ত্বার্থ অপেক্ষা স্বজাতির কল্যাণ অধিক চান। বাউটন বঙ্গরাজের নিকটেও ইংরাজ জাতির বাগিজোর সুবিধা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৬৫৬ সালে জগদীতে ইংরাজেরা কুঠি ও এক দুর্গ নির্মাণ করেন।

১৬৪০ সালে বিজয় নগরের রামরাজার আত্মার নিকট হইতে মাজাজ লাভ করেন। ১ ম চার্লসের আদেশানুসারে এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ হয় এবং তাণ্ডা ফোর্ট সেট জর্জ নামে অভিহিত হয়।

বোম্বাই নগর পর্তুগিজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। পর্তুগালের রাজ কন্যা কাথারিন ব্রাগোজার সহিত ইংলণ্ডের ২য় চার্লসের বিবাহ হয় এবং যৌতুক স্বরূপ এই দ্বীপ প্রদত্ত হয়। ১৬৬৮ অব্দে রাজা উদা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করেন।

বঙ্গদেশের মধ্যে পিপলী নামক স্থানে ইংরাজেরা সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন। ১৬৫৬ অব্দে জগদীতে কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু রাজবিদ্বেষিতা ক্রমে ১৬৮৮ সালে সম্রাট আরেঞ্জীর আদেশে এই স্থান এবং কাশিম বাজার, পাটনা, সুরাট এবং অন্যান্য স্থান হইতে দূরীকৃত হন। বোম্বাই হইতে কেবল তাঁহাদিগের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

অরেন্জীর পৌত্র আজিম ওসেন বঙ্গদেশের নবাব হন, তাহার অর্থের অভাব। ইংরাজেরা ১৬৬৬ অব্দে তাহার নিকট হইতে সুরাট, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই ৩ টি গ্রাম জয় করেন। যব চাণক এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী, তাহার নামানুসারে বারাকপুর চানক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সময় তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা। তাহার সম্মানার্থ

কলিকাতায় গড় নির্মাণ হয় এবং তাহা ফোর্ট উইলিয়ম নামে আখ্যাত হয়।

১৭১৬ সালে ফেরোক শিয়ার দিল্লীর সম্রাট। রাজপুতানার মারওয়ারের রাজা অজিত সিংহের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু সম্রাটের পীড়া হেতু বিবাহের বিলম্ব হইয়া পড়ে। এই সময়ে এক দল ইংরাজ অজুগহপ্রার্থী হইয়া রাজসভার উপস্থিত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে গাব্রিয়েল হানিল্টন নামে এক জন দ্বুচ ডাক্তার ছিলেন, তিনি চিকিৎসা করিয়া সম্রাটকে আরোগ্য করেন। ডাক্তারকে পুরস্কারের কথা জিজ্ঞাস্য করিলে তিনি ইচ্ছা ইতিয়া কোম্পানির জন্য বঙ্গদেশ মধ্যে ৩৭ টী নগর লইয়া একটি জমিদারী এবং বাণিজ্য পুঙ্খ হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়। ইহাতে কলিকাতাকে একটি প্রেসিডেন্সী করা হইল। সুরাট ও বাঙ্গালার এক এক প্রেসিডেন্সী বলিয়া উক্ত হইল। তৎকালে প্রেসিডেন্সীর অর্থ—বাণিজ্য কুটী সকলের প্রধান আভুসা।

বঙ্গদেশে প্রথমে ইংরাজদিগের অতি সামান্য কুটি ছিল, কিন্তু সম্রাট ফেরোক শিয়ারের অজুগহে তাঁহারি এখানে একটি জমিদারী করিয়া বসিলেন। যাহা হউক তাঁহারি এককালে নিরাশ্রয় হইতে পারেন নাই। মুরসিদাবাদের নবাব মুরসিদ কুলি খাঁ তাঁহাদিগের বাণিজ্যের পথরোধ করিবার অনেক চেষ্টা করেন। ১৭২৫ সালে কুলি খাঁর মৃত্যু হয়, তাঁহার পুত্র সুল্লাউদ্দৌলা ইহাদিগের প্রতি সদায়তা প্রকাশ করেন। সুল্লাউদ্দৌলা হইলে আলিবাদী খাঁ নামে তাঁহার এক ওমরা সিংহাসন বলপূর্বক অধিকার করেন। ইনি প্রজাদিগের অনেক কল্যাণ সাধন করেন। ইংরাজদিগের নিকট হইতে কর লইতে ক্ষমতা করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান পূর্বক রক্ষা করিতেও ক্ষমতা করেন না। মারহাট্টারা এই সময় দেশ মধ্যে ঘোর দৌরাত্ম্য করে, কলিকাতাও আক্রমণ করিতে আইসে, আলিবাদী কলিকাতার চারি দিকে গড় খুঁড়িয়া ইংরাজদিগের রক্ষার উপায় করেন। সেই গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান এবং তাহা 'মারহাট্টা ডিচ' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে।

আলিবাদীর মৃত্যু হইলে ১৭৫৬ সালে সেরাজউদ্দৌলা নবাব হন। যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চারিটী অনর্থ একত্রে তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল। তিনি রাজা মধ্যে অনেক প্রকার অত্যা-

চার ও নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়া প্রজাদিগকে উদ্ভ্যস্ত করেন। ইংরাজদিগের উপর তাঁহার রাগ হইবার বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁকার রাজ্য রাজবল্লভের ধন আত্মসাৎ করিবার জন্য তিনি চেষ্টা পান। কিন্তু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হন। নবাব তাঁহাকে চাহিয়া পাঠাইলে ইংরাজেরা পাঠাইতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা বাণিজ্য করিয়া অনেক টাকা করিয়াছে এই মনে করিয়া নবাব সে টাকার সোভী হইয়াছিলেন। এতদ্বিধ ইংরাজেরা ভাল করিয়া কেলা বাধিতে ছিল, ইহাতেও তিনি বিরক্ত হন। কাশিম-বাঙ্গার কোম্পানির যে ক্ষুটি ছিল, তাহা তিনি লুণ্ঠ করেন এবং তদ্ব্যতীত ইংরাজদিগকে করদ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ১৭৫৬ সালের ১৬ ই জুন নবাব কলিকাতায় উপস্থিত হন। ইংরাজেরা যুদ্ধে নিতান্ত অপ্রস্তুত ছিলেন, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। নবাব অসম্মান্যে তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিলেন। ইংরাজেরা ভাড়াতাড়ি কি করিবেন স্থির করিবার জন্য সভা করিলেন। বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগের শাসনকর্তা ডেক সাহেব ভর পাইয়া অগ্রে জাহাজে পলায়ন করিলেন। জাহাজ সকল চলিয়া গেল।

অবশিষ্ট ইংরাজেরা হলওয়েল সাহেবকে আপনাদিগের সেনাপতি করিলেন এবং দুর্গমধ্যে প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। পরিশেষে অক্ষম হইয়া নবাবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। নবাব টাকা অন্বেষণ করিয়া আকাঙ্ক্ষা সন্ত পাইলেন না। ১৮৬ জন ইংরাজকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। ইংরাজেরা অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান জন্য একটি ক্ষুদ্র কারাগার করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই গৃহটি ১২ হাত লম্বা ও ৮ হাত প্রশস্ত, ইহার এক দুই ধারে দুইটি ক্ষুদ্র গরাক ছিল। গ্রীষ্মকালের রাতে ১৪৬ জন ইংরাজ তাহার মধ্যে দাৰুণ গরমীতে ও ভূষণে নিপুণ নায় হইয়া উঠিল। তাহারা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও এক ফোঁটা জল পাইল না। গরমের দিকে সকলে কুঁকিয়া একে একে মরিয়া ভূষিতে পড়িতে লাগিল।

মৃতদিগের উপরে দাঁড়াইয়া অন্যেরা নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। অবশেষে প্রাতে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র ইংরাজ অর্ধ মৃতাবস্থায় বহিষ্কৃত হইল। এই ঘটনাটী অল্পকাল হত্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইরোডেরা এই নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইবার জন্য অল্প দিন পরেই সমুদায় বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন।

ভারতবর্ষে যুবরাজের আগমন।



মহারাণী বিক্টোরিয়ার কোঠা পুত্র যুবরাজ আলবার্ট এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস্ গত ৮ই নবেম্বর ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ৪ মাস কাল সমুদায় ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ১০ ই মার্চ ভারতভূমি পরি-
ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতেশ্বরী স্বয়ং কখন ভারতে আসিতে পারেন না,
যুবরাজের আগমনে সকলে তাঁহাকে ভারতেশ্বরীর প্রতিকৃতি বলিয়া গ্রহণ
করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি আমাদের ভাবী সম্রাট, এজন্য লোকের
হৃদয় স্বাভাবতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। অনেকে
বহু বায়বীকার করিয়া রাজদর্শন স্থগ লভ্য করিয়াছেন, অনেকে বহু
অর্থ অকাতরে বিতরণ করিয়া সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। যুব-
রাজ যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই আলোক, বাজী, ভোজ এবং অভিনন্দন
পত্র দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হইয়াছে, বড় বড় রাজা ও ধনী মহুয়া তাঁহাকে
নানাবিধ উপঢৌকন দান করিয়াছেন। কোন স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনার
কিছু মাত্র জট হয় নাই। যুবরাজ ও প্রুস শরীরে প্রফুল্ল চিত্তে সর্বত্র
ভ্রমণ করিয়া যাইবার সময় অপার আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং
ইংলণ্ডে থাকিয়া এ দেশের কল্যাণ চিন্তা করিবেন এজন্য আশা প্রদান
করিয়াছেন। জগদীশ্বর যুবরাজকে নির্বিঘ্নে স্বদেশে উত্তীর্ণ করুক এবং
দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের হিতচিন্তায় নিবিষ্ট করুক। আমাদের
পাঠিকাগণের অনেকে যুবরাজের সমদর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন,
তাঁহাদিগের সান্তনা দানার্থ আমরা বাম্যাবোধিনীতে তাঁহার একটা সুন্দর
প্রতিনিধি প্রকটন করিলাম। বামাগণ ইহা দেখিয়া রাজভক্তি প্ররতি
চরিতার্থ করুক। এ দেশের রমণীগণের রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা
যুবরাজের আগমনে আপনাদিগের হৃদয়শুদ্ধ আনন্দ তাব প্রকাশ করিয়া
আমাদিগের নিকট কয়েকখানি পত্র লেখেন। আমরা সেগুলি যথা সময়ে
প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়াছি। যথাহউক তাঁহাদিগের
কৃতজ্ঞতা উপহার স্মরণিত রাখিবার জন্য এহলে গ্রহণ করিলাম।

উপহার।

এসো গো ভারত ভগ্নী সকলে মিলিয়া।

করি তাঁর যশো গান একত্র হইয়া।

যিনি পাঠালেন পুত্রে জনধির পায়ে ।
 ভারত বাসীর দুঃখ দূর করিবারে ॥
 যদিও আছে তঁার প্রতিনিধিগণ ।
 যাঁহাদের স্মৃতিচারে জুখী হয় মন ॥
 কত যে ভারত শোভা তাঁদের কারণে ।
 অবলা অক্ষম তাহা করিতে বর্ণন ॥
 এক্ষণে মহাত্মা নতুংক বাহাদুর ।
 ভারতবাসীর দুঃখ করিছেন দূর ॥
 দুর্ভিক্ষেতে করিলেন রক্ষা প্রজাগণে ।
 অন্ন তিক্ত দিয়া যত দীন দুঃখী জনে ॥
 মহাত্মা টেম্পল তাঁরো মহিমা প্রচুর ।
 বাসনা বন্ধের দুঃখ করিবারে দূর ॥
 তাহাতে তাঁহার ক্রটি অণুনাভ নাই ।
 এই কথা ভারতের কহেন সবাই ॥
 হাইকোর্ট অধিবাসী বিচারকগণ ।
 রাজ নীতি ধর্ম নীতি রসে নিমগন ॥
 মতরাণী বিষ্টোরিয়া তথ্য কুমারে ।
 পাঠালেন প্রজাদের দুঃখ জানিবারে ॥
 হে ভারতবাসীগণ ঘেবা দুঃখ আছে ।
 আসিয়া জানাও তাহা যুবরাজ কাছে ॥
 ভারত মাতার দুঃখ রহিবে না আর ।
 সত্যই জানিবে নহে অন্যথা তাহার ॥
 যার যত দুঃখ আছে রেখনা গোপন ।
 ভারত মাতার দুঃখ কর নিবারণ ॥
 সদা কাগ জানি তাঁর বাসনা এমন ।
 বীর মধ্যে গণ্য হয় তাঁর পুত্র গণ ॥
 বীর প্রসবিনী তাঁরে সকলেই কয় ।
 সে আশা তাঁহার প্রায় হয়েছিল লয় ॥

এবার হইবে তাঁর বাসনা পূরণ ।
 আর না করিতে হবে অশ্রু বিসর্জন ॥
 যুবরাজ এসেছেন ভারতে যখন ।
 অবশ্য হইবে তাঁর দুঃখে নিবারণ ॥
 এবার হইবে বিদ্যালয়ের উন্নতি ।
 ভারত সন্তানদের রবেনা দুর্গতি ॥
 রাজার প্রসাদ লাভ সকলে করিলে ।
 ভারত সন্তানগণ আনন্দে থাকিলে ॥
 ভারত মাতার ক্ষোভ হবে নিবারণ ।
 আর না করিতে হবে অশ্রু বরিষণ ॥
 ভারতবাসীর দুঃখ করিতে মোচন ।
 যুবরাজ ভারতে করিলা পদার্পণ ॥
 এস এস প্রাণের ভারতকন্যা গণ ।
 সকলে মিলিয়া করি মঙ্গলাচরণ ॥
 রাজা হুখী হলে হবে প্রজার মঙ্গল ।
 দূরে যাবে আমাদের দুঃখের অনল ॥
 রাজভক্তি আমাদের আছে চিরধর্ম ।
 সকলে মিলিয়া করি রাজ প্রিয়কর্ম ॥
 রামচন্দ্র হইলেন যবে বনবাসী,
 অযোধ্যার প্রজা সব হইল সন্ন্যাসী ।
 রঘুনাথ অযোধ্যায় আইলেন যবে ।
 আনন্দে মগন হলো প্রজাগণ সবে ॥
 আমাদের বহু ভাগ্য মানিতে হইল ।
 রাজ আগমনে দেশ পবিত্র হইল ॥
 দ্বৈধর ককন যুবরাজের মঙ্গল ।
 সদা বাঞ্ছা করি মোরা তাঁহারি কুশল ॥
 এস এস প্রাণের ভারতকন্যা গণ ।
 সকলে মিলিয়া করি মঙ্গলাচরণ ॥

নির্জিয়ে মাঘের রাজ্যে করিয়া ভ্রমণ ।

ককন প্রফুল্ল মনে স্বদেশ গমন ॥

জননীর শ্রীচরণ করিয়ে বন্দন ।

রাজবধূ মনসুখ ককন বর্জন ॥

দীর্ঘজীবী হয়ে চৈথরেতে রাশি মতি ।

জননীর নিকটে শিশুন রাজনীতি ॥

শ্রীমতী হেমাদ্বিনী ।

বরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারতে শুভাগমন ।

অচ্ছ কিবা শুভদিন শুন ভগ্নীগণ ।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বঙ্গে আগমন ॥

প্রিন্স আসিছেন শুনি বঙ্গ বাসীগণ ।

হৃদয়ে সবাঁকার উথলয় মন ॥

আসিবেন সুবরাজ বঙ্গ ভগ্নীগণ ।

নিজ নিজ গৃহে কর মঙ্গলাচরণ ॥

সুবরাজ আগমনে বঙ্গবাসী যত ।

আনন্দউৎসব সবে করে কত পত ॥

নিজ নিজ ঘরে সবে আনন্দে মাতিকে ।

প্রফুল্ল অঙ্করে মুখ সাগরে ভাসিছে ॥

সুবরাজ আসিছেন বৈহাতে সকলে ।

মহোৎসব করিছে অপার কুতূহলে ॥

মহাশয়ী-পুত্র বলি করে সমাদর ।

অর্থ বায় তরে কেহ না হয় কান্দর ॥

“অয় ভিক্টোরিয়া অয়, কুমারের অয় ॥”

এই কথা সর্বদেশে প্রতিধ্বনি হয় ॥

প্রিন্স আসিছেন ইচ্ছা করিয়া শ্রবণ ।

দীন ভাণ্ডী সকলেই আনন্দে মগন ॥

দীন দুঃখী গণ সবে ভাবে মনে মনে ।
 “দুঃখের বারতা কব রাজ সন্নিধানে ॥
 তাহা হলে মহারাজা অমূল্য হবে ।
 আমাদের সকলের দুঃখ দূরে যাবে ॥
 তাহা হলে আমাদের হবে সুখোদয় ॥”
 এই কথা দীন দুঃখী সকলেই কয় ॥
 ভবিষ্যৎ রাজা তিনি অতি দয়াবান ।
 দয়া করি সবারে করেন অর্থ দান ॥
 আশা করি দীন দীন ! দুঃখিদের প্রতি ।
 প্রিয় অব ওয়েল্‌সের থাকে যেন মতি ॥
 অন্ন বস্ত্রহীন ব্যক্তি আছে যে সকল ।
 তাহাদের আশা যেন হয়গো সফল ॥
 যাহা হ'ক ভগ্নীগণ ! করি নিবেদন ।
 লভ'য়ে বধেছিল আছে কি স্মরণ ?
 সে রূপ ছরু'ন্ত যদি আসে পুনরায় ।
 তাহা হলে ভগ্নীগণ ! কি হবে উপায় ?
 কুমারের অমঙ্গলে আসে গো আতঙ্ক ।
 তাহা হলে আমাদের হইবে কলঙ্ক ॥
 অতএব বদবাসি শুন নিবেদন ।
 অ্যামোস প্রমোদে মাতি ভুলনা কখন ॥
 সকলের স্থির দুষ্টি থাকে গো ইহাতে ।
 কেহ যেন অমঙ্গল না পারে করিতে ॥
 প্রিয় অব ওয়েল্‌স, শুন ভগ্নীগণ !
 নিরাপদে করিবেন স্বদেশে গমন ॥
 ইহাতে যে কি আনন্দ বলিবার নয় ।
 তাহা হলে হবে সবে সুখী সান্তিশয় ॥
 দৈবর কখন এই সুবরাজ্য প্রতি ।
 স্বদেশে কিরিয়া গিয়া সুখী হন অতি ॥

এক মনে এ পার্থনা করিলে সকলে।

সর্বত্র প্রিয় যেন থাকেন কুশলে ॥

কুমারী নীরোদ বোধিনী মিত্র।

বঙ্কয়ান।

উপন্যাস।

বঙ্গীয় রসগীর্গণের অধিকাংশ ‘দ্বৈ-
শ্বর ভোক্তা’ ও ‘বিচ্ছাদিফার ফল’
এইরূপ পুরাতন বিষয়ের উপর
রচনা লিখিয়া আপনাদিগের বিচ্ছা-
দিফার পরিচয় দিয়া থাকেন।
তাঁহাদিগের প্রথমোক্ত্যন বর্ণিয়া আ-
মরা পুনঃ পুনঃ এক প্রকার বিষয়
ও ভাবের রচনা গ্রহণ করিয়া থাকি।
কিন্তু বামাগণ নানা বিষয়ে লেখনী
চালনা করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের
উন্নতি ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া
যায় না। আমরা তাহারই জন্ত প্র-
তীক্ষা করিতেছি। সম্ভ্রান্তি আমাদি-
গের একজন মাননীয়া পাঠিকা এক
খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন দেখিয়া
পূরম আপ্যায়িত হইলাম। তাঁহার
পত্র ও লিখিত উপন্যাসের কিয়দংশ
এখানে সমাদরে প্রকাশিত হইল।

“আপনাদের যে একটি ভগিনী
বামাবোধিনীতে মধো মধো আনিক-
ময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যা নববর্ষ,
ইত্যাদি ২।১ খানি রচনা প্রদান

করিত, সে আজ এক খানি উপন্যাস
হস্তে উপস্থিত হইল, তরসা করি
এখানার সমুদায় দোষ সংশোধন
করিয়া উপন্যাসের স্থানে প্রকাশ
পূর্বক আমাকে উৎসাহ প্রদান
করিবেন। বামাবোধিনী আমার
অত্যন্ত হৃদয়ের প্রিয় বস্তু, ইচ্ছা
হয় যে বামাবোধিনীকে সন্তোষপূর্ণ
উপন্যাসের দ্বারা সান্তাই, কিন্তু
আমার ন্যায় বিচ্ছাদিফার বাসনা
কতদূর কার্যো পরিণত হইতে পারে,
তাহা লেখা বাহুল্য। আমার এই
প্রথম উপন্যাস লেখা, ইতিপূর্বে
আর কখনও উপন্যাস লিখি নাই।
শুদ্ধ বামাবোধিনীতে প্রদান করি-
বার অভিলাষেই এখানি লিখিয়াছি
এবং আপনাদের সহৃদয়তার প্রতি
নির্ভর করিয়া বলিতেছি যে এখা-
নাকে পত্রিকাতে স্থান দান করুন।
আমি প্রতি মাসে বামাবোধিনীতে
উপন্যাস এবং প্রীলোকদিগের অ-
ন্যান্য হিতকারী বিষয়ের রচনা
পাঠাইতে বাসনা করি, যদি আপ-
নারা আমাকে একটু উৎসাহ প্রদান

করেন, তবেই আমার আশা সফল হইতে পারে।

আমি উপন্যাস অথবা অন্যান্য বিষয় লিখিতে অনেক সাহায্য লাইব না, অতুগ্রহ পূর্বক আপনি একটু দৃষ্টি করিয়া দিবেন।”

উপন্যাস—কুললক্ষ্মী।

বেলা প্রায় অপরাহ্ন, পৃথিবী তপনাতপে দ্বাস্তা হইয়া এখন সেই স্থনিপুণ বিশ্বচরিতার কৌশলে শীতল ছায়ায় আবৃত হইয়াছেন। পাখীগুলি কিচিকুচি ধ্বনি করিয়া কুলায়ে পশিতেছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিভক্ত। একটি পল্লীর নাম “আটপাড়া”। আটপাড়া জনশূন্য, অধিকাংশ জঙ্গলাবৃত। সেই স্থানে কয়েক ঘর অধিবাসী আছে, তন্মধ্যে জ্যোতী ব্রাহ্মণ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রই অধিক। পূর্বে বলা হইয়াছে উক্ত পল্লী অরণ্যাকীর্ণ, পল্লীর ভিতরে একটি বড় গুহুর আছে, তাহা এত বড়, যে দীর্ঘিকা বলিলেও বলা যাইতে পারে। দীর্ঘিকাতে জল আছে কি না বর্তমান কালের লোকেরা বলিতে পারে না কেননা তাহার উপরে মল ও হোগলা বন বিরাজ

করিতেছে। দীর্ঘির পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ে লোকালয় এবং পশ্চিম ও উত্তর পাড়ে বিজ্ঞান অরণ্য—বায়ু, বন্যবরাহ, শৃগল প্রভৃতির আশ্রয় স্থান হইয়া আছে। উত্তর দিকের অরণ্য অপেক্ষা পশ্চিম দিকের অরণ্যে লোকের কিঞ্চিৎ গত্যাত আছে। কাষ্ঠ ইত্যাদি কাটিবার জন্য কাঠুরিয়ারা কর্চৎ তাহাতে যাইয়া থাকে, তজ্জন্য দক্ষিণ পাড় হইতে একটি নদীর্ঘ পথ সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অরণ্যের যেস্থান অত্যন্ত নিবিড় এবং বড় বড় বৃক্ষাদ্বাদিত, তথায় একটি প্রাচীন “উরিগাব” বৃক্ষমূলে একটি নবীনা বালা এক খানা কাগজ হস্তে বসিয়া আছে। বোধ হয় কাগজ খানা কাহারও “ফটোগ্রাফ” হইবে, নচেৎ কেন সে তাহার প্রতি অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। বোধ হয় ইহা কোন দূরস্থ আত্মীয়ের প্রতিকৃতি। যুবতীর মূর্তি প্রাশস্ত, স্থির অথচ ভ্রূখাবনত। সমুদায় শরীরটী একখানি সামান্য বসনে আবৃত, কেবল মুখখানি অনাচ্ছাদিত, যুবতীর বর্ণ শ্যাম, চক্ষু জুটী বিশাল, বক্ষিম এবং উবাকালের আকাশবৎ নীলিম, কেশ পাশ সুদীর্ঘ কাল রেশ-

বৃহৎ
আলু-
যুব-
যুবতী
য়া জানি
! দেখিবা
ভবায় জন্য
খানায়
এক বাজা-
খা লিখিত
মি চলিলাম—
না চলিলাম।
যাইবার সময়
র দেখিয়া যাইতে
যদি বাঁচিয়া থাকি
র সহিত সাফাৎ
কোথায় কি জন্য যাই-
নিতে পারিবে। সরলা!
সেহ দীনবন্ধুকে ডাক, তিনিই
তোমাকে রক্ষা করিবেন, তিনিই
উপায়হীন। বালিকার সহায় হই-
বেন। আর কিছুই বলিতে পারিলাম
না শীঘ্র বিদায় হইলাম, পিতা
সহায় আসিতেছেন এষ্ট ক্ষণেই
পাপ বিবাহের জন্ত দৃষ্ট করি-
বেন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

সেই চন্দ্রবিনোদমুখোপাধ্যায়।”

কুললক্ষ্মী পড়িতে পড়িতে একে-
বারে অস্থির হইল। কত অশ্রু যিম্মু-
তার অকোমল গণ্ডস্থল বাহিয়া বরিল
কে গরিবে? এই বিজন বিপিনে
অভাগিনী কুলীন কুমারীর জুংথে
কে স্থঃখিত হইবে? তাহার যে এক
মাত্র জীবনের আত্মীয় ছিলেন
তিনিও চলিয়া গিয়াছেন, আর কে
তাৎকালে সাহসনা দান করিবে? কুল-
লক্ষ্মীর মনে উপর্যুপরি অনেক কথা
উঠিয়া কণ্ঠ রোধ করিল। ইচ্ছা
হইতে লাগিল শীঘ্র কোন আত্মীয়-
রকে মনের কথা জানায়া। আর আত্মীয়
কে? একমাত্র আত্মীয় বিনোদ বাবু,
তাহাকে কেমনে মনের কথা জানা-
ইবে? ইহা মনে করিয়া কুললক্ষ্মী
আরও বঁদ্বিহনে লাগিল কঁাদিতে ২
মুক্তিকালে লিখিতে লাগিল।
‘বিনোদ বাবু যাইবেন না, আপনার
সরলায় আর কেহ রহিল না,
কার কাছে রেখে যান? আমার
মা নাই, ভাই নাই, বোন নাই,
আপনিই আমার এক মাত্র আত্মীয়,
আপনিই আমাকে দয়াময় হৃদয়কে
চিনাইয়াছেন, শোকের সময় সাহসনা
দিয়াছেন : এখন আর কে আমাকে
তেমন আদর করিয়া ডাকিবে,
তেমন যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে?’

আমি এই মক ভূমিতে বাঁচিতে পারিব না। আমার মা নাই, কে আমার মা ছিলেন, কোথায় তাঁর পিত্রালয় ছিল, কেও জানেন না। পিতা বলেন আমার মাতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন, আমি এক বৎসর কাল বিমাতার পিত্রালয়ে পড়ে রয়েছি, কত যন্ত্রণা পেতেছি ঈশ্বরই জানেন। সকল যন্ত্রণা আপনার পত্রে ভুলিতাম, এখন কি পত্রও লিখিবেন না? হে দীন বন্ধু! তোমার এই অভাগিনী তনয়ার উপায় নাই, শীঘ্র তোমার চরণে শ্রান দেও। কাদিতে কুললক্ষ্মীর শরীর অবশ হইল, ক্রমে ক্রমে কুললক্ষ্মী অজ্ঞান হইয়া রক্ততলে পড়িয়া রহিল। কেবল দুই একটি মেজধারা মৃত্যু ফলের ন্যায় গুপ্ত বহিরা পড়িতে লাগিল, দুই একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ুর সহিত মিশাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। বিজনারণ্যে অন্ধকারের ছায়া পড়িল। কুললক্ষ্মী অনেকক্ষণ পরে সন্ধ্যার শীতল বায়ু স্পর্শে সংজ্ঞালাভ করিল। দেখে হেম প্রভা তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া মৃদু মৃদু ডাকিতেছে। হেমপ্রভার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, বোধ হয় কুললক্ষ্মীর অপেক্ষা ষাৎ বৎসরের ছোট হইবে।

আব
বর্ণ
নহে।
সন্ধ্যার
সহকারে
এখানে এ
খুঁজেছি এ
বিমর্ষিতা বহু
কুললক্ষ্মী ব,
করে জানলে।
তুমি এখানে এ
হেম চল চল
বক্ষে মুখ লুকাইয়া
লাগিল, “কেন এসে
বলতে পারি না।”
এখানে পেয়েছি দেখি
হয় বেন আর বার আমার
য়েছি। আমার মাকে যদিও অ,
নাট, তবু কেন জানি না, বিশ্বাস হয়
যে আমার মা ঠিক তোমার মত
ছিল।” কুললক্ষ্মী হেমপ্রভার চক্ষের
জল মুছাইয়া বলিল “হেম তুমি
কেননা, চল ঘরে চল।” কুললক্ষ্মীর
মস্ত্রে হেমপ্রভার কান্না থামিল না
বরং আরও আদর করতে ক্রন্দন
বৃদ্ধি হইল। কুললক্ষ্মী বলিল
“হেম! তোমার মাতানহের বাড়ী
কোথা ছিল তোমার স্মরণ হয়?”

হেম বলিল “না দিদি! আমিও তাহা কিছুই জানিনা। আমার পিতাকে তাহাও জানিনা। সকলেই বলে মা আমাকে গদাধর চক্রবর্তীর নিকট ৩০০ টাকায় বেচিয়াছিলেন, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন।” কুললক্ষ্মী বলিল “ভাল হেম! তোমাকে গদাধর ভট্টাচার্য্য যদি বিবাহের জন্য আনিয়া থাকেন, তবে কেন তিনি তোমাকে বিবাহ না করিয়া অন্যত্র বিবাহ করিলেন?” হেম—দিদি! সে অনেক কথা, এখন বলিবার সময় নয়। “হয়ত তুমি কুলের বাহির হয়েছ বলে তোমার মা চোল দিয়েছেন, সকাল ২ ঘরে চল, সময়ান্তরে আমার বিষয় শুনিতে পাইবে।” কুললক্ষ্মী—“তবে চল, আমার আর সে ক্ষণে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতেছে না।” কুললক্ষ্মী অন্য মনে এই কথা

কয়টি বলিতে ২ আর একবার সতৃষ্ণনয়নে ফটোগ্রাফ থানার প্রতি দৃষ্টি করিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। কুললক্ষ্মী সযতনে ফটোগ্রাফ থানা নিজ পরিধেয় বসনে ঢাকিয়া লইয়া বলিল “হেম! তুমি বাড়ীতে যাও, নাজানি তোমায় কত গল্পনা শুনিতে হয় আমি চলিলাম।” কুললক্ষ্মী হেম প্রত্যেকে পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অরণ্য হইতে বাহির হইলেন। হেম প্রভাত অরুণ হইয়া অন্য পথে কুললক্ষ্মীকে চাহিতে ধীরে ধীরে চলিলেন। পুষ্করিণীর পাড় হইতে যে একটি সঙ্গীর্ণ পথ গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কুললক্ষ্মী সেই পথ ধরিয়া একটি ক্ষুদ্র বাড়ীতে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ ।

১। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইংলণ্ডের ‘এস্পেন্স অব ইণ্ডিয়া’ অর্থাৎ ভারতেশ্বরী উপাধিধারণ করিবেন হির হইয়াছে। বুধবারের ভারতবর্ষে আগমনে ভার-

তের প্রতি মহারাণীর অধিক স্নেহ সঞ্চারিত হইয়াছে, তিনি এ বৎসরের পার্লামেন্ট খুলিবার দিন ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন এবং স্বয়ং ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

২। আমরা গতাত্ত শোকর্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ এ

ফাফুদন বরাহ নগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালী জীলোকদিগের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম ইংলণ্ড দর্শন করেন। ইনি একজন অতি সংপ্রকৃতি, গুণবতী ও পতিভক্তি পরায়ণা রমণী ছিলেন। জগদীশ্বর তাঁহার স্নেহ ক্রোড়ে ইহাঁকে রক্ষা করুন।

৩। কুমারী ৱ ভারত-
বর্ষের অনেক ভ্রমণ এবং

ভারতের কল্যাণার্থ অনেক চেষ্টা ও উৎসাহ দান করিয়া পুনরায় বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইনি শশিপদ বাবুর দুইটী শিশুকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য সমস্তি ব্যাধারে লইয়া বাইতেছেন।

৪। এসিয়াতে জীপিকার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। সেণ্ট পিটার্স বর্গ আফ্রিকায় তীর্থ ও অল্প চিকিৎসার পরীক্ষার্থীরা হইয়া ১২৫ জন যুবতী উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

মাতৃ বিয়োগে কন্যার খেদ।

হে কল্যায় পরমেশ্বর! অল্প সাঙ্কেতিক মাস আমার পরম হিতৈষিনী গর্ভধারিণী জননী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এত দিবস আপনার প্রসাদে মাতৃক্রোড়ে অতুল সুখ সম্ভোগ করতঃ কালান্তিপাত করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে কৃপাবলোকন পূর্বক রক্ষা কর। আমাদিগের ভার এত-

দিন ব্রহ্মময়ী মাতার চক্ষে সমর্পণ করিয়াছিলে, কিন্তু এক্ষণে নিরাশ্রয়া হইয়া একমনে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে পরমেশ্বর! আমি জানিতেছি যে তুমি তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি ও আমাদিগের রক্ষক করিয়া দিয়াছিলে। এ সময়ে তিনি আমাদিগের ভার সমস্তই তোমার উপর নির্ভর করিয়া মায়া-জাল কর্তন পূর্বক তোমার সুশীতল চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হে জগদীশ্বর! আমরা তাঁহাকে যেরূপ বড়ো রাখিয়াছিলাম, তোমার নিকট তদ্রূপেই সহস্রগুণ বড়ের সহিত

বঞ্চিত হইয়া স্বাধীনতা করিতে
ছেন। হে করুণানিধান
পরমেশ। আমরা এই অকু
সাগরে নিষ্কিন্দ্র হইয়া কেবল তোমা-
রই নাম মাত্র অবলম্বন করিয়া জীবন
যাত্রা নির্বাহ করিতেছি। হে নাথ।
তোমার চরণে বার বার নমস্কার
করি।

হা মাতঃ! তুমি আমাদের প্রতি
কিষ্কণ্ডে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার
করিলে। হে স্নেহময়ী জননি! আমরা
দিবানিশি তোমার নিমিত্ত হাহাকার
করিয়া বেড়াইতেছি, বোধ হয় তুমি
স্বর্গ লোক হইতে তাহা জানিতে
পারিতেছ। কিন্তু জানিতে পারিয়াও
কি তোমার মনে একটু দয়ার উদ্বেগ
হয় না? হা মাতঃ! তুমি কোথায়
রহিলে! তোমা বিহীন হইয়া আর
আমাদের জীবন ধারণে কিছু-
মাত্র স্পৃহা হইতেছে না। যেমন
ফণী মর্গ হারা হইয়া চারি দিক
অন্ধকারময় দেখিয়া থাকে, আমরা
সেইরূপ তোমাকে হারা হইয়া পৃথিবী
শূন্যময় দেখিতেছি। হায়! স্নেহময়ী!
একবার আমাদের প্রতি স্নেহের
দৃষ্টিপাত কর, একবার আমাদের
নয়নপথের পথিক হও, আমরা
তোমার সেই চন্দ্রসুখখানি দেখিয়া

মনে শান্তি লাভ করি ও বক্ষঃস্থলে
রাখিয়া বুক শীতল করি। বুক
বিদীর্ণ হইতেছে আর এ চরিত্রবৎ
শোক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।
জননী গো! কত দিনে এই কঠোর
যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। হায়!
তোমার সেই স্নেহপূর্ণ বয়ান খানি
কি বিস্মৃত হইব? উঃ! এ কথা
মনে করিতে ক্ষম্য বিদীর্ণ হইয়া যায়,
না কখন ভুলিব না। তোমার সেই
মৃদু মন্দ চলন, অগঠিত কলেবর,
নবকিশলয়কর যুগল ও অদৃশ্য চাক
নেত্রের স্নেহব্যঞ্জক দৃষ্টি যাবজ্জীবন
হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে এবং অধা-
ম্য বদন বিনির্গত বাক্য অহরহ কর্ণ
কুহরে প্রবিষ্ট হইবে। জননি! আর
কি তোমার সে স্নেহপূর্ণ কথা শ্রবণ
করিতে পাইব না, আমরা কি আর
মা বলিয়া ডাকিয়া মনের কথা ব্যক্ত
করিতে ও তোমার সহিত প্রস্তুত
আহার সামগ্রী ভোজন করিয়া তৃপ্তি
লাভ করিতে পাইব না? এ কথা
অন্তরে উদিত হইলে হৃদয় দগ্ধ হইতে
থাকে। তোমার মুখ শরনে স্বপনে
ও জাগ্রতাবস্থায় সকল সময়েই
অস্তরে গাঁথা রহিয়াছে। একবার
মনে করি যে, তুমি আমাদের কেহ
নহ, যদি কেহ হইতে, তাহা হইলে

আমাদিগকে অনাথা করিয়া ফেলিয়া যাইতে না এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে থাকি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে ভাবনা আসিয়া মনকে বিচলিত করিয়া ফেলে, কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। মাগো, আমাদের এ সমস্ত যত্নশ্রম কেন দিয়া পলাইয়া গেলে? গর্তধারিণি! আমরা চারি দিকে দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু কাহাকেও তেমন দেখিতে পাই না, স্নেহ বা ক্যা আর প্রবণ গোচর হয় না। কেইবা নে ভাবে ডাকিবে? সুখার সময় কে বা আহার দিয়া কুখা নিবারণ করিবে?

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তোমাকে নয়নগোচর করিতাম, তোমার আদরে সকলের নিকট প্রিয়পাত্র ছিলাম। আমরা যদিও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট দুগ্ধপোষ্য সন্তানের মত কত আদরে করিতাম। তুমি তাহাজে কিছু মাত্র বিরক্ত হইতে না। এই ধরণীতলে যাহার মা নাই, তাহার আর কিছুতেই স্থখ নাই, সকলই অস্থির স্থান বোধ হয়। এস জননি! একবার তোমার হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয়ের সমুদায় যত্নশ্রম দূর করি।

হায় মাতঃ কত সময় তোমার

কথার অবস্থা হইয়া কতই বিরক্ত হই। না জানি আবার অনেক সময় গ্যাবস্থায় কব্যবহার দ্বারা মনোবেদনা দিয়াছি। জননী গো সে সমুদায় এক্ষণে চিন্তা করিলে বক্ষঃস্থল শেল বিদ্ধ হইতে থাকে। স্নেহময়ি! এই ভয়ানক অপরাধ মার্জনা কর।

হে ককণানিধান সৃষ্টিকর্তা! তোমার কন্যাকে যে আমরা কত কষ্ট দিয়াছি, কথার অবস্থা হইয়া কত পাপের ভাগী হইয়াছি, তৎসমুদায় অপরাধ এই তুংখিনী পাপীয়সী কন্যার প্রতি ককণা বিতরণ পূর্বক ক্ষমা কর। এক্ষণে তুমিই আমাদের এক মাত্র ভরসা, এ পাপীয়সীর উপর তুমি দৃষ্টিপাত না করিলে আর কে করিবে এবং কেইবা বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া চক্ষের জল মুছাইবে? তোমার পুণ্যবতী কন্যা তোমার হস্তে আজ সমর্পণ পূর্বক নিশ্চিত্ত মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমরা তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে তাহাকে তোমার পদতলে স্থান দিয়া তাহার সকল দুঃখ দূর কর এবং তাহাকে তোমার অমৃত নিকেতনের অধিকারিণী কর।

শ্রীমতী.....মিত্র।

কোমলগর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাদেব দালনীয়া বিদ্যালয়ান্দিয়লত:

১৪২-১০ সংখ্যা { পৌষ ৬ মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৮২। { ১১ শ তাং

ধর্ম প্ররুতি।

ভক্তিভাবে জগদীশ্বরে কায়মনপ্রাণ উৎসর্গ করিলে, জ্ঞান চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে অসুখ্যমীকূপে হৃদয়মন্দিরে বিদ্যমান দেখা যায়। জ্ঞানীলোকেই সেই অসুখ্যোক্তি প্রভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন এবং তৎসাধনে প্ররুত হন। ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন লোকদিগের হৃদয়েও তিনি সেইরূপ বিরাগমান আছেন, তথাপি তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন না। তাহারা কুপ্ররুতিদ্বারা বিপথে ভ্রান্ত হইয়া নানা কষ্টভোগ করে, তথাপি তিনি সর্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করেন এবং সুযোগ পাইলেই সেই বিপথগামীদিগকে সংপথে উত্তেজিত করেন, ইহাকে পণ্ডিতেরা বিবেক বা ধর্মজ্ঞানের কার্য বলিয়া থাকেন। মহাপাপীরও ধর্মজ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা অতি দুর্বল। তাহার কুপ্ররুতি সকলই প্রবল। তাহারা দণ্ডভয়েই কৃষ্টিয়া হইতে বিরত থাকে, তাহারা জগদীশ্বরকে রাগান্বিত ও প্রতিহিংসাগ্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাঁহাকে ভয়ানক আকারে কল্পনা করে। লোকেই প্রায় ভয়দ্বারা কৃষ্টিয়া হইতে বিরত হয়, এই জন্য কোন জ্ঞানী লোক কহিয়াছেন যে “দৈশ্বতে ভয় জ্ঞানের আরম্ভ।” বাস্তবিক এ কথা সত্য। কিন্তু ইহার অপেক্ষা উচ্চতর কথা এই “ঈশ্বরে প্রেম জ্ঞানের শেষ।” কিন্তু বাহ্যিকের ধর্ম ভয় নাই, শুদ্ধ রাজদণ্ড ভয়ে তাহারা অন্যায় কর্ম হইতে বিরত থাকে, তাহারা নিরুচ্ছ্র জ্ঞানী লোক।

রাজনগরীত ব্যক্তিরা কুকর্মের প্রবৃত্ত থাকে, কেবল কিরূপে দোষনি প্রকাশ না হয় তাহারই চেষ্টা পায়। সুযোগ পাইলে এবং দোষ প্রকাশিত হইবার ভয় না থাকিলে তাহারা কোন কুকর্ম করিতে সঙ্কুচিত হয় না। তথাপি তাহাদের ধর্মার্থ জ্ঞান নাই একথা বলা অসম্ভব, কেননা তাহা না থাকিলে তাহাদের দোষ গোপন করিবার চেষ্টা কিসের জন্য? শুদ্ধ দণ্ডভয়ে তাহারা সেরূপ চেষ্টা করে একথা সত্য নহে, দণ্ডভয় না থাকিলেও তাহারা দোষ প্রকাশিত রাহিতে সাবধান থাকে, এবং কুকর্মের অহুষ্ঠান সময়ে বিশেষতঃ যখন কোন কুকর্ম প্রথম করিতে যায়, তাহাদের চিত্ত কিছু না কিছু সঙ্কুচিত হয়। এই জন্য মিথ্যা কথা এবং শঠতাদ্বারাই তাহারা নির্দোষরূপে পরিচিত হইতে চায়। আরো ভয় ও কষ্টের সহিত কুকর্ম করিবার কারণ কি? লাভের আশা না থাকিলে প্রায় লোকমাজেই কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব তাহারা প্রধানতঃ স্বার্থপরতার অহুরোধে পড়িয়া এবং কখনও কুপ্রবৃত্তিসমূহ দমন রাহিতে সক্ষম না হইয়া কুকর্ম করিয়া থাকে। পরের মানিনিন্দাদ্বারা আত্মাৎকর্য সাধন করিতে, পরপীড়নদ্বারা স্বকীয় কার্যোদ্ধার করিতে গেলে নীচতম স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু কোন কোন লোককে পরের মানিতেই আনন্দানুভব করিতে, পরপীড়নদ্বারা আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে এবং সামান্যতঃ কুপ্রবৃত্তি বশতঃই কুকর্ম করিতে দেখা যায়। একরূপ লোক অতি ভয়ানক, ইহারা নররূপী পশু, দণ্ড ইহাদের ঐশ্বর্য এবং শাসন করিতে না পারিলে ইহাদিগকে সমাজ হইতে পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। বাহ্যিক স্বার্থ সাধনার্থ কুকর্ম করে, তাহাদের বুদ্ধির দোষ, তাহাদিগকে প্রথমতঃ দণ্ডদ্বারাই কুকর্ম হইতে বিরত করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের নিকট বথার্থ আত্মহতাহুঁরাগী ব্যক্তির ব্যবহার প্রদর্শিত হইলে, এবং উপদেশদ্বারা ধর্মপথ সুখগম্য ও সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট কোশল এমন হৃদয়দম্ব করাইরা দিলে তাহাদের স্তমতি হইবার অনেক সম্ভাবনা।

ধর্মভীত ব্যক্তিরা প্রায় ধর্মভয়বশতঃ কুকর্মহইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু তথাপি কুপ্রবৃত্তি সকল তাহাদের মনে সম্পূর্ণ সঞ্চারিত থাকিতে পারে, এবং ধর্ম ভয়ের হীনতা হইলে সেই সকল প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের মনে নানা প্রকার কুকর্মের যতদূর কল্পনা হয়, ধর্ম ভয়ে ততদূর কার্যে পরিণত হইতে

পারে না। এইরূপ লোকদিগকে শাসনে রাখিবার নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা স্বর্গ নরকাদি রূপে ধর্মার্থের ফলাফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। ঈশ্বর ধর্মার্থের বিচারকর্তা ও শাসনকর্তা, ধর্মভীত ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস থাকিতে দুঃপ্রবৃত্তি সকল তাহার সনকে বস কলুষিত করক, তাহাকে কুকার্যে অধিক দূর লইয়া যাইতে পারে না। অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ অবস্থা। ধর্মভয়-বিহীন শুদ্ধ রাজদণ্ড ভীত নররূগীন্দ্রের সংখ্যা অনেক হইলেও তাহার লোকনির্মিত ও দণ্ডতান্ত্রিত হইয়া লোক সমাজকে দূষিত করিতে পারে না। যাহাচউক এই পৃথিবীতে যথার্থ ধর্মপরায়ণ ঈশ্বরনিষ্ঠ মানুষ্যজিন ও আছে। এমন মানুষ্যলোককেই ধর্ম জীবনের আদর্শ বলিয়া সম্মান করা কর্তব্য এবং এমন মানুষ্যলোকের সহবাসই ভাব্যব তরণে নৌকারূপ। এরূপ মানুষ্যলোকে ও ধর্মভীত ব্যক্তিতে বিস্তর প্রভেদ। মানুষ্যজিন অনায়াস কার্য হইতে বিরত হন, তাহা ধর্মভীত ব্যক্তির ন্যায় শুদ্ধ দণ্ডভয়ে বা লোকাপবাদে নহে, কিন্তু জগদীশ্বরের অপ্রিয় কার্য বলিয়া তিনি কুকার্য হইতে নিবৃত্ত এবং যথাসাধ্য সংকার্য সাধনে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু যেনন জগদীশ্বরের অপ্রিয় কার্য অকর্তব্য, শুদ্ধ এই বিবেচনাই অসংকার্য হইতে নিবৃত্তির কারণ নহে, ধর্মভয় লোকাপবাদ রাজশাসন ইত্যাদি কারণেও লোকে অনায়াস কার্য হইতে বিরত থাকে; তেমনি সংকার্যে প্রবৃত্তি হইবার কারণ শুদ্ধ জগদীশ্বরের প্রিয় কার্যসাধনের কর্তব্যতাবোধ মাত্র নহে, তাহার অন্য অনেক কারণও আছে। অনেক লোকের ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস যে পুণ্য ও পাপ বিকল্প ধর্ম হওয়াতে পুণ্য সঞ্চয়দ্বারা পাপক্ষয় হয়, কেহ কেহ লোকের প্রশংসাস্বাদজন হইবার জন্য এবং অনেকে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সংকল্প করিয়া থাকে। বাস্তবিক ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি বাস্তবিক অপরিবেহ সাহিত্যভাবে সংকল্পাছুষ্ঠান করিতে পারে না। নিজ গৌরববৃদ্ধি, লোক প্রশংসা ইত্যাদি তাহাদিগের অভিনিষ্ঠ থাকে। সামান্যতঃ সার কথা এই যে সৎকর্ম জ্ঞান হইলেই সৎকোচিত অতুরাগ প্রকাশ পায়, সেই অতুরাগই লোকে তছুপযুক্ত কার্যে প্রবৃত্ত করে, কার্য কর্তব্য বা অকর্তব্য তাহা অন্তরাস্ত্রের সহিত পরামর্শ দ্বারা জানা যায় এবং কার্যের ফলাফলদ্বারাও জানা যাইতে পারে। জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করিব এইরূপ

বিবেচনাপূর্বক কার্য করিলেই অপর লোকের সম্বন্ধে ও সমাজ সম্বন্ধে সমস্ত কর্তব্য কার্যই সাধন করা যায়। তথাপি সমস্ত বিশেষে বিশেষ কর্তব্যসাধনে প্রবর্তিত করিবার জন্য বিশেষ প্ররুত্তিও আছে। সন্তানাদিকে লালন পালন করিতে হয়, তাহার কারণ জগদীশ্বর আমার প্রতি যে সকল ভার সমর্পণ করিয়াছেন তাহা উপযুক্তরূপে নির্বাহ করা তাহার প্রিয়কার্য। কিন্তু সেসকল বিবেচনা দ্বারা কর্তব্য সাধন করিতে হইলে অধিকাংশ লোকের কর্তব্য কার্য সম্পাদন করা হয় না। অতএব জগদীশ্বর কীভাবে মনে সন্তানের প্রতি স্নেহরূপ যে প্রবল প্ররুত্তি দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত লোকেরা সন্তান প্রতিপালনে প্ররুত্ত হইয়া থাকেন, এবং ধর্মজ্ঞানহীন পশুরাও শুদ্ধ স্নেহ বশতঃই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয়। অতএব জগদীশ্বরের প্রিয়কার্যসাধন করিতে হইলে স্বাভাবিক প্ররুত্তি সকলকে বিনাশ করিতে হয়, এক্ষণে মনে করা কর্তব্য জ্ঞানহীন লোকের কার্য। যদি কেহ বলেন যে স্নেহ, ভক্তি, রতজতা, দেশানুরাগ ইত্যাদি দ্বারা লোকেরা যথোচিত কার্যে নিয়োজিত হইলে ঈশ্বর প্রতি পরায়ণ হইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যেমন ভৌতিক পদার্থের নিয়মামুসারে ভৌতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, তেমনি মানসিক নিয়মামুসারে মনুষ্যের প্ররুত্তি সকলের কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তথাপি মনুষ্যের ধর্মজ্ঞান থাকিতে প্ররুত্তি সকল সৎ বা অসৎ বিচার করিতে পারে এবং স্বেচ্ছামুসারে কার্য করিবার ক্ষমতা থাকিতে সকলেই স্বীয় কাব্যের নিমিত্ত দায়ী। পশুরা স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা যেসকল চানিত হয়, সেইরূপেই চলে, তাহাদিগের ধর্মাবশ্য বিষয়ে দায়িত্ব নাই। মনুষ্য দায়ী বলিয়া কোন প্ররুত্তি সৎ বা অসৎ তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক সুতরাং কোন কার্য জগদীশ্বরের প্রিয় বা অপ্রিয় তাহাও জ্ঞান আবশ্যক, কেননা যাহা প্রিয় তাহা সৎ এবং যাহা অপ্রিয় তাহা অসৎ। স্নেহবশতঃই সন্তান প্রতিপালন করা কর্তব্য, কিন্তু স্নেহ যে সৎ প্ররুত্তি এবং শিশুপালন যে কর্তব্য কর্ম তাহা স্থির করিতে হইলে তাহা জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য বলিয়া বুঝিলেই আর কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনই কর্তব্য এই নিয়মটি ধর্মাবশ্য বিচারের ক্ষতি-পাতর বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা

পাত্রকে দয়া করেন, ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করে। এইরূপে তিনি যে কোন সৎ কর্ম্মাচর্য্য করেন, কোন প্রকার স্বার্থ লাভে আশা তাহার প্রবর্ত্তক হয় না, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়াই তিনি তাহা সম্পাদন করেন। তিনি যে অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন, তাহা কোন প্রকার দণ্ড বা অপমান ভয়ে নহে, তাহার কারণ কেবল এই যে তাহা জগদীশ্বরের অপ্রিয় কার্য্য। আর একটী বিষয়ে তাঁহার সর্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ব আছে তাহা এই যে তাঁহার কার্য্য যেমন সৎ, চরিত্র যেমন সাধু, মনও তেমনি দোষ-স্পন্দ-শূন্য। অসংচিন্তা, পাপ কল্পনা, অপবিত্র ভাব তাঁহার মনে স্থান পায় না। মন্দ কর্ম্ম কি দুষ্চরিত্র কাহাকে বলে এরূপ জ্ঞান তাঁহার অবশ্যই আছে, কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি কখন কুণ্ঠে ধাবমান হয় না। দণ্ডনীতি ব্যবস্থাপক মন্ত্রীদিগকে যেমন কুক্তিয়া শঠতা ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করিয়া অস্থির করিতে হয়, সেইরূপ তাঁহার মনে মন্দ ভাব উন্নয় হইতে পারে, কিন্তু মর্পণে গোময়ের প্রতিবিম্ব যেমন মর্পণকে মলিন বা দূষিত করে না, সেইরূপ অসংচিন্তা তাঁহার মনকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। তাঁহার নিমিত্ত রাজ্যশাসন ব্যবস্থা বা স্বর্ণ নরক কল্পনা কিছুই আবশ্যিকতা নাই। তাঁহার প্রেমময় হৃদয়ে ভয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহার পিতা, তিনিই তাঁহার বন্ধু, তিনিই তাঁহার রাজা, তাঁহার কাহাকে ভয় বা কিসের অভাব? জগদীশ্বরে অচলা ভক্তি এবং প্রার্থন উৎসর্গনা করিলে মনে এরূপ একাগ্রতা ও পবিত্র ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে না। কিন্তু যেমন সকল কার্য্যই শিক্ষা বা অভ্যাস করিতে হয়, তেমনি এরূপ মনের ভাবের নিমিত্ত শিক্ষা বা অভ্যাস আবশ্যিক। সেই শিক্ষার উপায় আত্মশাসন বা আত্মপরীক্ষা। এই দুইটির বিষয়ে ধর্ম্মার্থী মাত্রেই বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

কুপ্রবৃত্তি সমূহকে অনিষ্টবিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপ্রবৃত্তিসমূহকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত করার নাম আত্মশাসন। কাম ক্রোধাদি ত্রিপু সকল আত্মার পরম শত্রু, ইহারা মনকে কুকার্য্যে রত করিতে সর্বদা চেষ্টা করে এবং তাহাদের বশবর্ত্তী আত্মাই আত্মার শত্রু। প্রথমতঃ প্রবৃত্তি সকলের মধো কোনটী সৎ বা কোনটী অসৎ তাহা স্থির করিতে হয়। অন্তর্য়ামী জগদীশ্বরই অন্তরীন্দ্রিয় মধো ধর্ম্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া দে শিক্ষার উপায় করিয়া

দিয়াছেন । যেমন দর্শনে দ্বিধা দ্বারা বর্ণজ্ঞান হয়, রসনে স্নিগ্ধ্য দ্বারা রসজ্ঞান হয়, তেমনি অন্তরাঙ্গ দ্বারা জ্ঞান ও ধর্মপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সদসৎকার্যের বিবেচনা, সৎকার্যে প্রবৃত্তি ও অসৎকার্যে হইতে নিবৃত্তি আপনা হইতে সম্পন্ন হয় । যেমন দর্শনে স্নিগ্ধ্যের দোষে দৃষ্টিভ্রম হয় এবং তাহা হইলে তর্ক দ্বারা অথবা অনালোকের দর্শনের সহিত তুলনা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত ধর্মাদি জ্ঞান হয়, তেমনি ধর্মজ্ঞানের দৌর্বল্য প্রযুক্ত সদসৎ বিবেচনার দোষ হইলে কার্যের কলাকল বিচার দ্বারা অথবা অপব লোকের মত বিচার দ্বারা যথার্থ সদসৎ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে । আপনার কার্যের ভাল মন্দ বিবেচনা সকল সময়ে আপনি করা যায় না, অপরের সহিত পরামর্শ করিতে হয় এবং কখন ২ শত্রুর মতও বুঝিতে হয় । সদসৎ জ্ঞান হইলে দেখা যায় যে অন্তরাঙ্গা মনকে অসৎকার্যে হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎকার্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে, এবং কুপ্রবৃত্তি সকল তদ্বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে । মন যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে কুপ্রবৃত্তি হইতে বিরত করিয়া অন্তরাঙ্গার আদেশানুসারে চালিত করাই আত্মশাসন । কোন কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে কি না, মধ্যে ২ তাহার তদ্বাবধান না করিলে কার্যে ক্রমশঃ দোষ জন্মে, সুতরাং যে ২ কার্য করা গিয়া থাকে, সে সকল কর্তব্যাকর্তব্য নিয়মানুসারে সাধিত হইয়াছে কি না, তাহাও মধ্যে পরীক্ষা করা আবশ্যিক, ইহার নাম আত্মপরীক্ষা । প্রত্যহ সকল কার্য শেষ করিয়া নিজার পূর্বে সাবধানে আপনার কার্যের দোষ অনুসন্ধান পূর্বক আত্মপরীক্ষা করিবে এবং দোষ থাকিলে, আত্মতৎসনা অনুতাপ, ভাবী কার্যে দোষ পরিহারার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং তৎসাধনে সমর্থ হইবার নিমিত্ত জগদীশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা করিবে, এবং প্রত্যহেও সেইরূপ ভক্তিভাবে তাহার সাহায্য প্রার্থনা পূর্বক কার্যারম্ভ করিবে । এইরূপ অভ্যাস দ্বারা মনের পবিত্রতা, ধীরতা, একাগ্রতা ও শান্তি লাভ হয় ।

সেন্ট ক্লেরার ।

ব্রাহ্মলোকেরা কেবল সংসার সংসার করিয়া মরে, তাহাদিগের জীবনে বিশুদ্ধ ও গভীর ধর্মের ভাব অতি অল্প, এই বলিয়া অনেক ধর্মোপদেষ্টা

আক্ষেপ করেন। কিন্তু পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের জীবনেও ধর্মচরিত্র যে অতি উজ্জ্বলভাবে বিকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকানেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমরা ভারতের তত্ত্বাগ্রগণ্য মীরা বাই (১) ও আরো দুই একটা ধর্মপরায়া রমণীর উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছি। আজি রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রিত্তি একটি কুমারীর আখ্যান লিপিবদ্ধ করিলাম। ধর্মের উত্তেজনার নারীজীবনেও যে কতদূর সংসার বিরাগী ও ঈশ্বর-রূপী হইতে পারে, তাহা ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে।

ইটালি দেশে কেভেরিনো নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার তিনটা কন্যা ছিল, ক্লেয়ার, এলগিস্ ও বিট্রিস্; তন্মধ্যে ক্লেয়ারই সর্বজ্যোষ্ঠা। তিনি বাল্যকাল হইতেই উদারপ্রকৃতি ও ধর্মাহুরাগিনী ছিলেন। যখন তিনি বালিকা, তখন তাঁহার পিতা মাতা বিবাহের কথা বলিতেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক বৈরাগ্য এতদূর প্রবল ছিল, যে পিতা

(১) মীরা বাইর একটি অতি সুন্দর ভক্তের গান:—

“হরিসে লাগি রহ ডাই, তেরা বনাতে বনাতে বনি যাই।

অঙ্কা তারে, বন্ধা তারে, তারে সূজন কসাই, আর ৬ গা পড়ায় গনিকা তারে, তারে মীরা বাই।

দৌলত ছুনিয়া মাল খাজানা বেগিয়া বয়েল চরাই, আর একবাৎ কে ঠাণ্ডা লাগে খোঁজ খবর নেহি পাই।

আরসি ভক্তি কর ঘট তিতর, ছোড় কপট চতুরাই, সেবাতক্তি আওর অধীনতা, সহজে মিলি গোসাঞী।

ভাই! হরিতে সর্বদা মন লাগাইয়া থাক, থাকিতে থাকিতে ক্রমে তোমার মন তাঁহার প্রতি আসক্ত হইবে। হরি নামের গুণে অঙ্কা ও বন্ধা নামে দুই পাপী তরিয়াছে, আর সূজন নামে একজন কসাই তরিয়াছে, শুক পক্ষীকে হরিনাম পড়াইয়া এক গনিকা তরিয়াছে, মীরাবাইও তরিবে। বনিক্ বলদের পৃষ্ঠে ধন চাপাইয়া কত লাভের আশায় বাগিজ্য করে, কিন্তু মৃত্যু হইলে সব ফুরায়। কাপটা চাতুরী ছড়িয়া মনের ভিতর যথার্থ ভক্তি সঞ্চয় কর, ঈশ্বরের সেবা বন্দনা ও অধীনতা স্বীকার কর, সহজে তাঁহাকে পাইবে।

মাতার সে প্রভাবে তিনি নিরতিশয় ক্লান্ত হইতেন। তৎকালে সেন্ট ফ্রান্সিস নামক একজন সুবিখ্যাত সাধু পুণ্ড্র স্বীয় পবিত্র জীবনের অসামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সর্বসাধারণের অতুরাগ ও প্রশংসাজনন হইয়াছিলেন। ক্রোয়ার আপনার মনোগত ভাব জীবনে পরিণত করিবার মানসে একদা ঐ সাধু সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার অলৌকিক বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও দৈববোধ প্রতি প্রেম দেখিয়া ক্রোয়ার একেবারে এরূপ মোহিত ও বিগলিত হইয়া গেলেন যে তিনি সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ সংসার পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা না করিয়া আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন না। সেন্ট ফ্রান্সিস যে ধর্ম্য মন্দিরে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন, ক্রোয়ার এক দিন ধর্মোপদেশ শ্রবণমানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া ক্রোয়ারের চিত্ত নিতান্ত অস্থির ও সংসারের প্রতি বিরাগী হইয়া উঠিল। অবশেষে সংসারে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি একদিন সংগোপনে গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া ফ্রান্সিসের আশ্রমে উপনীত ও তাঁহার শরণাগত হইলেন। তিনি তথায় গিয়া আপনার অম্লর পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি চিরদিনের মত স্বীয় অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া বেদির সমক্ষে উৎসর্গ করিলেন। সেন্ট ফ্রান্সিস্ বহুতে তাঁহার চাঁচর কেশ কাটিয়া মণ্ডকমুণ্ডন করিয়া দিলেন এবং বৈরাগোর বস্ত্র ও এক গাছি ডোর পরিধানের জন্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার আশ্রমে সন্ন্যাসিনীদিগের অবস্থিতির স্থান ছিল না বলিয়া তিনি সেই অক্ষায়াশ ববী'য়া সন্ন্যাসিনী ক্রোয়ারকে একটি স্বতন্ত্র আশ্রমে রাখিয়া দিলেন।

অতি অল্পকালের মধ্যে ক্রোয়ারের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল। এই কথা প্রচারিত হইতে না হইতেই সংসারের সমুদায় লোক এক বাক্যে তাঁহার প্রতি অত্যাচার ও দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। একদা তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আশ্রম হইতে তাঁহাকে আনিবার জন্য বলপূর্বক তাঁহাতে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার হাত পা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। বিনীত ক্রোয়ার অনেক কষ্টে কোন প্রকারে তাঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি এমন বলপূর্বক বেদি ধরিয়া-

ছিলেন যে টানাটানিতে তাঁহার পরিচ্ছদের অঙ্গাংশ আত্মীয়-
গণের হস্তে ছিঁড়িয়া আসিল। তিনি আত্মীয়দিগের মনে দয়া ও স্নানার
উদ্বেক করিয়া দিবার জন্য বারবার স্বীয় মুণ্ডিত মস্তক দেখাইতে লাগিলেন
এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন “প্রভু! আপন কার্ণের জন্য আমাকে
আহ্বান করিয়াছেন এবং তিনি ব্যতীত আমার কবরের আর কেহ স্বামী
নাই।” ক্রোড়ের এ বিষয়ে নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল যে বন্ধুবান্ধবেরা যতই
তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিবেন, দয়াময় পরমেশ্বর ততই তাহা অতিক্রম
করিবার শক্তি বিধান করিবেন। অবশেষে তাঁহার আত্মীয়গণ নিতান্ত অব-
মানিত হইয়া এই কথা বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন “তুমি
সদংশজাত হইয়া একরূপ নীচ ও জঘন্য রুতি অবলম্বনপূর্বক সম্ভ্রান্ত বংশের
যৎপরোনাস্তি অপমান করিলে।” কিন্তু ক্রোড়ের সকল প্রকার অপমান ও
তিরস্কার অজ্ঞানবদনে মজ্জা করিলেন। তাঁহার জীবনে পরিশেষে দৈবের ও
মর্ত্যের মহিমা বহীর্গত হইল। কিছুদিন পরেই তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী
এলগিস এই দুঃসংসারের অহুসরণ করিয়া বাটী হইতে পলায়ন করিলেন এবং
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আশ্রয় লইয়া চির বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। শ্বেনোক
ঘটনান্তে ক্রোড়ের বংশীয় তাবৎ লোক এবং সংসারের অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
সকলে যৎপরোনাস্তি কোপানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার
বার জন ভ্রাতৃ শুণ্ডাকে ক্লান্সিসের আশ্রমে বলপূর্বক প্রবেশিত করিয়া সেই
চতুর্দিশবর্ষীয়া বালিকাকে তিরস্কার ও প্রহার করিতে করিতে ধূলির উপর
দিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলেন। “ভগ্নী ক্রোড়! আমাকে রক্ষা কর, প্রভুর
সেবা ও তোমার প্রেমপূর্ণ সহবাস হইতে আমাকে বিচ্যুত হইতে
দিও না।” এই বলিয়া সেই অসহায় নবীন সম্মাসিনী চীৎকার রবে জন্মন
করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার স্নেহ প্রতিক্ষা ও সাধু ইচ্ছার জয়
হইল। কারণ “সাধু বাহার ইচ্ছা দৈব তাহার সহায়।” দয়াগণ নিতান্ত
বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিরদ্বিবন পরে আচার্য্য
ক্লান্সিস বহুতে সেই রূপবতী স্তম্ভবতী অবলার মস্তক মুগ্ধন করিয়া দিয়া
তাঁহাকে দীনতা ও বৈরাগ্যের পরিচ্ছদ পরাইলেন। দীনতা ও শুদ্ধতার
এমনি আশ্চর্য্য বৌদ্ধিক ও প্রভাব যে তাঁহার মাতা ও তৎসংশ্লিষ্ট অপর

যোগ জন রমণী ও সৌন্দর্য্যে প্রমুখ হইয়া সমুদায় সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের দলভুক্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই যথাবিধি সম্মান ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্লেব্বারের অমুগামিনী হইয়া আপনাদিগকে কুতর্থাৎ মনে করিলেন। চতুর্দিকে এই বৈরাগ্যের অর্থ প্রজ্বলিত হওয়াতে তৎকালে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা আনন্দা ক্রান্তিসের সম্মাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রান্তিস এইটী উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া নারীদিগের জন্য একটা স্বতন্ত্র আশ্রম (Nunnery) সংস্থাপন করিলেন এবং ক্লেব্বারকে তাঁহার অধ্যক্ষ পদে বরণ করিলেন। তাঁহার জীবনের পবিত্রতা, মৌনতা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম দিন দিন এত বাড়িতে লাগিল যে অল্পদিনের মধ্যেই এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অগ্নি কখন প্রজ্জ্বল থাকে না। তাঁহার ধর্ম্মাগ্নি এরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে পার্শ্ববর্ত্তিনী অনেক নারী পতঙ্গের ন্যায় সেই অগ্নিতে নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহার এই স্বর্গীয় জীবনের দৃষ্টান্তে কতক রাজকন্যা মানমর্থাৎ পুনঃসম্পত্তি, বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কার ও ভোগ বিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার জীবনের স্বর্গীয় প্রভাবে ইউরোপের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।

ক্লেব্বার ঈদৃশ কষ্টসাধন করিতেন যে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত শরীর শীর্ণ বিবর্ণ ও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে তাঁহার শিষ্যগণও অতি দুষ্কর সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন প্রকার পাত্ৰকা ব্যবহার করিতেন না, ধূলিময় ভূমি শয্যাশয়ন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে, মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কাহিন্দ্রও সহিত কথোপকথন করিতেন না। তাঁহারা কখন কখন অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া নানাবিধ বস্ত্রের সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। যদিও ক্লেব্বারের শরীর তপস্যায় অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আত্মা অত্যন্ত তেজস্বী, প্রসন্ন ও ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিত। অত্যন্ত শারীরিক যত্নপার মধ্যে তাঁহার মুখ মধুর হাস্যে পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি মৌনতা ও বৈরাগ্যকে ইন্দ্রিয় রমন, আসক্ত পরিত্যাগ ও অহঙ্কার বা আমিহ বিনাশের প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন।

ক্রেয়ার দীনতা ও বৈরাগ্যকে ধৈর্য্য ও আত্মসংযমেরও প্রধান উপায় বলিয়া প্রতীতি করিতেন। এই কারণে তিনি ভুখ দারিত্র্যকে ধন সম্পত্তি অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তিনি একাকিনী সমস্ত পিতৃধনের অধিকারিণী হইলেন। ক্রেয়ার ঐ প্রচুর সম্পত্তি পাইয়া আনন্দে প্রাবৃত হইলেন। ভুই হস্তে তাহা অনাথ দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক কপর্দিকও নিজ বায় বা আশ্রমের জন্য রাখিলেন না। পোপ গ্রেগারি ক্রেয়ারের উদৃশী দানশীলতা দেখিয়া কিছু ভুঃখিত হইলেন এবং ঐ ধনের কিয়দংশ আশ্রমের জন্য রাখিতে তাঁহাকে অহুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সে অহুরোধ রক্ষা করিলেন না। কারণ তিনি ঈশ্বার এই উচ্চতর বৈরাগ্যের উপদেশসী জীবনে পরিণত করিা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন—“আকাশের পক্ষীদিগকে দেখে তাহারা বপন করে না, সংগ্রহ করেনা, এবং শস্যাগারে মঞ্চও করে না, তথাপি হোমনের অগ্নীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দেন।” ফলতঃ ঈশ্বার বৈরাগ্য ও নির্ভর তাঁহার আত্মার অতি মাংসে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ক্রেয়ার ঐ দুটাসুটী প্রদর্শন করিয়া বিনীত ভাবে অহুনয় সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “আপনি আমাকে দীনতা, দরিদ্রতা ও বৈরাগ্যের বিশুদ্ধ সূত্র হইতে বঞ্চিত করিবেন না। যদিও তিনি আশ্রমের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি এক দিনের জন্যও আপনাকে আশ্রমবাসিনীদের দাসী ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। আশ্রমের অধিবাসিনীদের দাসত্ব করাই তাঁহার জীবনের সর্বোচ্চ অভিলাষ ছিল বলিয়া তিনি তাহার ক্ষুদ্রতম অধিবাসীদের চরণ বহুতে প্রফালন করিতেন। আশ্রমের মধ্যে যাহারা ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন, তাহারা ভিক্ষা গ্ৰহীয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে ক্রেয়ার প্রতিদিন তাহাদের মুখ চুখন করিতেন এবং দ্বার হইতে তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করিয়া লইতেন। তিনি আহারের সময় প্রত্যেক বহুস্তে পরিবেশন করিয়া অধিবাসীদের সেবা করিতেন। তাঁহার হস্ত নিয়ত পীড়িত গোকে নিযুক্ত থাকিত। তিনি আপনাকে এত দূর নীচ কর্যে তাহা শুনিতে অবাক হইয়া যাইতে হয়। এমন কি

আত্মমবাসিনীদিগের পারীক্ষিক ক্রের ও তবিনিস্থত মলিন বস্ত্র পধ্যস্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। আচার্য্য সেন্ট ফ্রান্সিস আপন স্বর্গীয় জীবনের আলোকে তাঁহাকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ক্রেরারকে যখন ঘাছা আদেশ করিতেন, তিনি তাছা অজ্ঞানবদনে আনন্দমনে পালন করিতেন। তিনি শুকদেব ফ্রান্সিসের হস্তে আপনার সমুদায় প্রাণ মন একরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন যে তাঁহার আদেশ অত্যন্ত কঠোর ও দুঃসাধ্য হইলেও তাছা শিরোধার্য্য করিয়া মানিতেন। বস্ত্রতঃ দীনতা, নন্দ্যতা দয়া ও পরসেবা তাঁহার ক্ষমতার ভূষণ ছিল। অপবের অধীনতাই তাঁহার নির্মল সুখের হেতু ছিল বলিয়া ক্রেরার আপন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সেন্ট ফ্রান্সিসকে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন যে “আপনি আমাকে যেভাবে হয় নিযুক্ত করুন, আমি ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি, এখন আর আমি নিছের নহি, সম্পূর্ণরূপে আপনারই।”

প্রতি দিন তিনি অত্যন্ত প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন এবং উঠিয়াই আত্মমবাসিনীদিগের প্রভাত-বিজ্ঞাপক ঘণ্টা স্বহস্তে বাজাইতেন। এইরূপে বহুদিন ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে তিনি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই বিষম রোগ শয্যায় সুস্থ অবস্থাতেও ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অহুরাগ, আশা, উৎসাহ দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। প্রায় আটাইশ বৎসর তিনি দুঃসহ রোগ যন্ত্রণায় নিপতিত হইয়া একদিনের জন্যও বিষন্নচিত্ত বা নিরানন্দ হইয়া নাই; বরং তাহাতে আরও প্রসন্নতা মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি এই কথা বলিয়া ছিলেন “আমি সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের চরণে এজনা প্রণাম করি যে তিনি আমাকে এই বিষম ক্রোধ বহন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং পৃথিবীর রোগ ও যন্ত্রণা আমাকে কখন অভিভূত করিতে পারে নাই।” যে ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাহার নিকট কিছুই কষ্টকর বলিয়া প্রতীত হয় না। তাহার অন্তরে প্রেম নাট, তাহার নিকট সকলই অসহ। পরে ক্রেরার যখন আসন্ন কাল উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার শিষ্য ও ভগিনীগণ একান্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার পরে বিশ্বাস সন্দেহ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে তিনি সেই স্বর্গ ধামে

ব্যাপ্তি ও আকর্ষণের কথা বলিয়া তাহাদিগকে সাহসনা দিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্রেয়ার সেই জগৎ জননী ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে নগর কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ই আগষ্ট তারিখে ক্রেয়ারের মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরোপসনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল, একমাত্র উপাসনাকর্ত্তেই তিনি প্রচুর শাস্তি ও বল লাভ করিতেন। তিনি বিনীত হইবার জন্য নিয়ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন এবং বারম্বার মৃত্তিকা চুষন করিয়া চক্ষের জলে তাহা ধোত করিতেন। তিনি যখন উপাসনালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন তাহার শরীর মনের একত্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইত, যে সকলে তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি রূপে সম্মর্শন করিতেন।

হিন্দু বিবাহ।

বহু বিবাহ।

বহুবিবাহ যদিও হিন্দুজাতি মধ্যে প্রচলিত এবং কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রেণী মধ্যে তাহা অতি ভয়ানক ও যার পর নাই দুষণীয় বেশ ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের মতে বহুবিবাহ দূরে থাকুক, দ্বি-বিবাহও পুরুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত হয় নাই। যেখানে প্রথমা স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য অমুষ্ঠিত হইতে পারে না, সেই স্থানেই অল্প বিবাহের বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পুরুষ যেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে সমুৎসুক, সেখানে প্রথমা স্ত্রীর সম্ভোগসাধন ও সম্মতিগ্রহণ ব্যতীত তাহা করিতে অশক্ত। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এক ব্যক্তি এক স্ত্রী লইয়াই ধর্ম্মাহুতান ও সংসারযাত্রা নিরূহ করিবে ইহাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ছিল। তাহা না হইলে তাঁহারা কেবল ব্যতিরেক ও বিশেষস্থলে ইহার অমুমোদন করিতেন না।

যে যে কারণে পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, তাহা এই :—

‘মদ্যপান সাধুব্রতচ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।

ব্যাদিতা বাধিব্রতচ হিংস্রার্থদ্বীচ সর্বদা ॥

বক্ষ্যষ্টমে হবিবেদ্যাপে দশমৈতু মৃতপ্রজা ।
 একাদশে জী জননী সদ্যস্তু প্রিয়বাসিনী ॥
 যা রোগিনী স্যাভু হিতা সম্পন্ন্যচৈব শীলতাঃ ।
 সাহুজ্জাপ্যাবিবেক্তব্য। নাবমম্মাচ কহিহিং ॥
 মন্তঃ ॥

যে জী মদ্যপায়িনী, দুষ্টচারিণী, প্রতিকূলা, কুষ্ঠাদি ব্যাবিস্কুতা, হিংস্রা বা অর্থনাশিনী, তাহার পতি বিবাহ করিবেক। জী বক্ষ্য হইলে ৮ বৎসর, মৃত-বৎসা হইলে ১০ বৎসর, কেবল কন্যা প্রসবিনী হইলে ১১ বৎসর অপেক্ষা করিয়া তৎ পতি অন্য বিবাহ করিবেক, কিন্তু জী অপ্ৰিয়বাসিনী হইলে সদ্য বিবাহ করিবেক। যে জী রোগিনী হইয়াও হিতকারিণী ও সুশীলা, তাহার স্বামী তাহাকে জ্ঞানাইয়া অন্য বিবাহ করিবেক, কিন্তু তাহাকে অবজ্ঞা করি বেক না।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,

সুরাপী ব্যাধিতা ধর্তা বক্ষ্যার্থ্য্যাপ্রিয়ধনা ।

জী প্রসূতাবিবেক্তব্য। পুরুষদ্বৈতিনী তথা ॥

সুরাপায়িনী, কুষ্ঠাদি ব্যাবিস্কুতা, কলহকারিণী, বক্ষ্য, অর্থনাশিনী, অপ্ৰিয়-ভাষিণী, কন্যা মাত্র প্রসবিনী বা পতিদ্বৈতিনী জী সত্ত্ব পুরুষ অন্য বিবাহ করিবে।

উপরি উক্ত শাস্ত্রবচন সকলদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে শাস্ত্রকারগণ পারতপক্ষে একাধিক বিবাহ করিবার উপদেশ দিতেন না। জী বক্ষ্য, মৃত-বৎসা এবং কন্যা প্রসবিনী হইলে ৮, ১০ এবং ১১ বৎসর প্রতীক্ষা করিবার শাসন আছে, ইহার অন্য অর্থ এই যে এরূপ স্থলে বিবাহের কথা শীঘ্র তুলিতে নাই। বাস্তবিক এ সকল স্থলে জীদিগের কোন অপরাধ নাই এবং তাহাদিগের সহস্রশ্লিণীত্বের কোন ব্যাধি হয় না। জীকে লইয়া যেখানে একত্র ধর্মসংগম করিতে পারা যায় না, সেই খানে অন্য জী গ্রহণের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হই-
 যাচ্ছে। তবে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পুণ্য নরক হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, এবং চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়, ইহাও হিন্দুদিগের বিশ্বাস; এইজন্য জী পুত্র প্রসব না করিলে উপযুক্ত কাল অপেক্ষা করিয়া অন্য দার গ্রহণের বিধি আছে।

কিন্তু এ বলিয়া যথেষ্টাচারী হইয়া যত ইচ্ছা তত বিবাহ করা হিন্দুশাস্ত্রের
কখনই অনুমোদিত নহে। অপ্ৰিয়বাদিনী হীকে যে সদ্য পরিত্যাগ করিবার
বিধান আছে, ইহা বোধ হইতে ভয় প্রদর্শনার্থই।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

আমাদিগের পাঠিকাগণ ইতিপূর্বে গো-পাদপ বৃক্ষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া-
ছেন। ইহার ছাল কাটিলে অতি হৃদ্যদ হৃদয় কলস কলসপূর্ণ পাওয়া যায়,
তাহা গো হৃৎকের মত পুষ্টিকর। দক্ষিণ আমেরিকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপ সমূহে
এই বৃক্ষ সচরাচর উৎপন্ন হয়। এক জাতীয় বৃক্ষ হইতে যেমন হৃদয় পাওয়া
যায়, অপর জাতীয় বৃক্ষ হইতে তেমনি অতি নির্মূল সুশীতল জল পাওয়া
যায়। ইহার বিষয়ও আমরা বর্ণন করিয়াছি। পাঠিকাগণ আফ্রিকার ‘পথিক বৃক্ষ’
কথা শ্রবণ করিয়া দেখুন। মরুভূমি স্থলে এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ সাহায্যে
পানীয় জলের উপায় করিয়া দিয়া জগদীশ্বর কি অপার করুণার পরিচয় দিয়াছেন!
এই বৃক্ষ গাছ হইতে কেবল হৃদয় ও জল দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আরো
কত আশ্চর্য্য ও উপকারী বস্তু দিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া কর্তব্য।

পাঠিকাগণ ‘পিঠা’ গাছের গল্প শুনিয়াছেন। গাছ হইতে আপনাপনি
পিঠা উৎপন্ন হয়, ইহা গল্প কথা বলিয়া এককালে অসম্ভব মনে করিবেন না।
আফ্রিকাতে সত্য সত্যই ‘পিঠিক বৃক্ষ’ নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহাতে
পিঠিক আপনা আপনি ফলিয়া থাকে। আমরা দূরস্থ আফ্রিকার কথা বলিতে
যাই কেন, ভারতবর্ষের দক্ষিণে যে সিংহল দ্বীপ আছে, তাহাতে এই বৃক্ষ
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ‘গোরাম’ নামক স্থানে ইহা আতা গাছ অপেক্ষাও
বৃহৎ দেখা যায় এবং ইহার ফল পাকিলে নরম, হরিদ্রা বর্ণ এবং সুমিষ্ট হয়।
তত্ত্বত্যা অবিসমীরা ইহা আওণে সেকে। এই ফলের বিছু ফেলিয়া দিতে
হয় না, ইহার দানা কিংবা আঁটি নাই। ইহা রুটিরই মত এবং বৎসরের
মাঝে ৮ মাস পাওয়া যায়।

হিম প্রদান নরওয়ে দেশে শৈবাল ও জুড়ে গুল্ম ভিন্ন কোন বৃক্ষোকার বৃক্ষ
উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সেই সকল উদ্ভিদ হইতে অতি উপাদেয় রুটী প্রস্তুত
হয়, নরওয়েবাসীরা তাহা মহানন্দে ভক্ষণ করিয়া থাকে। অন্য প্রকারে

প্রস্তুত খাদ্য অপেক্ষা এই রুটী অত্যন্ত সুখাদ্য : আমাদের দেশে শেওলা আমরা পা দিয়া মাড়াইয়া যাই, কিন্তু তাহাই স্থান বিশেষে এমন সুস্বাদু পদার্থ! স্বষ্টিকর্ত্তা যেখানে যে বস্তুর যেমন প্রয়োজন, সেখানে সেইরূপ করিয়াছেন।

আফ্রিকাখণ্ডে 'সিরা' নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট নবনীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বৃক্ষ এক বৃক্ষের ন্যায় এবং ইহার ফল স্পেন-দেশের অলিভের সমৃশ। ইহা আসাফি ও কাবা জঙ্গলে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সিরা ফলের শাঁন হইতে নবনীত পাওয়া যায়। ইহা গো দুগ্ধে প্রস্তুত নবনীত অপেক্ষা ঘন, শ্বেতবর্ণ এবং আফ্রিকা পর্য্যটক মদ্রোপার্কের মতে অধিকতর উপাদেয়। আফ্রিকা যে এরূপ গরম দেশ, সেখানেও লবণ না দিয়া ইহা ১২ মাস টাটকা রাখা যায়। আফ্রিকার সিরালিয়নে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার ফল হইতে তুঙ্গের সরের ন্যায় সুখাদ্য পদার্থ পাওয়া যায়। বৃক্ষ হইতে গোন্ধের দুগ্ধ, সর ও নবনীত পাওয়া যায়, ইহার অপেক্ষা সুখের ও আশংকা আর কি আছে?

আফ্রিকার উত্তরাংশ অন্তরীপের নিকট টেবল ও ফল্‌স উপসাগরের তীরে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার বীচি মোমবাতীর মত জলে। আটলান্টিক মহাসাগরের আজোর্স দ্বীপে এবং আমেরিকাতেও এই বৃক্ষ 'কাভল্‌বেরী মার্টেল' বা মোমবাতী-বীজ-বৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। সুমাত্রা দ্বীপে এক প্রকার বৃক্ষ হইতে মোম উৎপন্ন হয়। চিনে কুইলে নামক এক বৃক্ষে সাবানের অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিনেতে থুরানিয়া নামে বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে রুটি মনোহর সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। গাছের ছাল হইতে অশ্রুজলের ন্যায় গোল গোল ফোঁটা বাহির হয়, তাহা দেখিতে শুষ্ক ও স্বচ্ছ, আস্বাদনে তিক্ত, কিন্তু ঘ্রাণে অত্যন্ত তৃপ্তিকর। ইহার গন্ধ আরবের প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্যের সহিত তুলনামূল্য হইতে পারে। এইদেশে সমুদ্র হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে 'বাসিল' নামে এক প্রকার বনা বৃক্ষ আছে, তাহার গাছে প্রাতঃকালে লবণপূর্ণ হইয়া থাকে, তত্রত্য লোকে তাহা চাচিয়া লবণরূপে ব্যবহার করে। আশ্চর্য্য যে এখানকার ভূমিতে লবণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মেক্সিকোতে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার ফল মুহূর্ত্তে অবস্থায় বানরের মুষ্টিবদ্ধ হস্তের ন্যায় এবং প্রস্তুতি অবস্থায় বানরের মুষ্টি খোলা

হস্তের ন্যায়। মেক্সিকোবানীরা ইহাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে এবং বহু দূর হইতে ইহার ফুল আনিতে যায়। এই বৃক্ষ কেবল এক স্থানে এক জাতীয় ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোর রাজকীয় উদ্যানে ইহার ডাল আনিয়া পোতা হয়, ১৮০৪ সালে তাহা হইতে ৪২ ফিট উচ্চ বৃক্ষ হইয়াছিল।

সিংহলে যে তালপত্র বৃক্ষ আছে, তাহার এক একটা পত্র ২০ জন মনুষ্যকে ঢাকিতে পারে, ইহা বৃহদাকার ছত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামে ট্রুলিনামে যে বৃক্ষ আছে, পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা বৃহৎ পত্র আর কোন বৃক্ষের নাই। ইহার এক একটা পাতা দীর্ঘে ৩০ ফিট এবং পরিসরে ৩ ফিট। সে দেশের লোকেরা তাহা দ্বারা ঘর ছাইয়া থাকে এবং তাহা অনেক দিন টেকে রাখা থাকে।

ভারতবর্ষের বটবৃক্ষ সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার বৃক্ষ। গুজরাটে কবীরবট নামে যে বৃক্ষ আছে, তাহার পরিধি ২০০০ ছুই সহস্র ফিট, তাহার ছায়ার ৩০০০০ লোকে সুখে বিশ্রাম করিতে পারে। সৈন্যদল যাতায়াতের সময় ইহার তলে দুই চারি সপ্তাহ ছাউনি করিয়া থাকে। গিনির স্বর্ণ ল কাপট নামে এক জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহার এই বটের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে। এই বৃক্ষের ছায়ার ২৩,০০০ লোক বিশ্রাম করিতে প

সংযুক্তা-হরণ

কনৌজরাজ জয়সিংহ স্বীয় কন্যা সংযুক্তার স্বয়ং উপলক্ষে মার্কভোম হইবার প্রয়াস পান। হস্তিনাদিগপতি পৃথুরাজ এতদর্থে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাহা অগ্রাহ করেন; কিন্তু সংযুক্তার এক পত্র পাইয়া মমৈত্তে জয়সিংহের রাজধানী আক্রমণ করিয়া স্বয়ংবর সভাস্থল হইতে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। কনৌজরাজ সমাগত রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া পৃথুরাজের পথাবরোধ করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু তিনি সময়ে শকণকে পরাভূত করিয়া কন্যা লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হন। জয়সিংহ অপমানিত হইয়া গান্ধারাদিগপতি মহম্মদ বোরীর শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া হস্তিনা আক্রমণ করেন। যুদ্ধস্থান কুরুক্ষেত্র। কনৌজ রাজকন্যা

প্রথমতঃ পৃথুকে যুদ্ধে নিরুত্তর হইতে অহরোধ করেন, কিন্তু পৃথুর বীরোচিত
বাক্য শ্রবণে পরিশেষে বীরাস্থনার ন্যায় স্বামীকে বিদায় দেন । যুদ্ধে পৃথুর জয়লাভ
হয় এবং মহম্মদ পলাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন । জয়সিংহ পৃথুর বন্দী
হন ; কিন্তু সংযুক্তার নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ থাকিতে পৃথুরাজ তাঁহাকে মুক্তি
দান করেন । বিশ্বাসঘাতক কনৌজরাজের কুমন্ত্রণায় মহম্মদ ঘোরী পরে
ছদ্মপূর্বক পৃথুরাজকে পরাজয় ও বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া যায় এবং সেখানে
তাঁহাকে বধ করে । পুণ্যভূমি আর্যাবর্ত এইরূপে প্রথম যবন করস্পর্শে অপবিত্র
হয় ।

পৃথুরাজ সংযুক্তার প্রণয়লিপি পাঠ করিয়া যখন দ্রুতকে বিদায় করেন, সেই
সময় হইতে এই কাব্যের আরম্ভ হইতেছে ।

দ্রুতেরে বিদায় দিয়া হস্তিনাধিপতি
চোহান-কুল-তিলক পৃথু মহামতি,
আগ্রহে প্রণয়-পত্রী করিয়া চুষন,
মল শাপ মেলি বীর করে অধ্যয়ন ।

এ যখন সমাপন হয়,
লিপি হৃদয়ে স্থাপয় ;
পুনঃ তুলিয়া যতনে,
পাঠ সতৃষ্ণ নয়নে ।

এই রূপে ডি রায় ছই তিন বার
নীরবে হলো না তৃপ্তি ; হৃদয়ের দ্বার
করি উদ্‌ঘটন শেষে, আবেশ অন্তরে,
উচ্চৈঃস্বরে করে পাঠ, অমুরাগ ভরে ।—

—“পৃথুনাথ ! কি বলিয়া সম্বোধিবো দাসী ?
কেনই বা নবোধন ? কি হেতু প্রকাশি
প্রগল্ভতা ? কুল-বালা লজ্জা পরিহরি,
অনাহুত এ লিখন লিখিলা কি করি ?
সরমে মরমে মরি অরিলে এ কথা !
কিন্তু, পৃথুধর, রোগী হৃদয়ের ব্যথা

না করে প্রকাশ যদি বৈদ্যের মদন,
 যন্ত্রণার উপশম হয় কি কখন ?
 প্রজেশ্বর কাছে ছুঁখ না জানালে পরে
 নিজে প্রজা, কতু রাজা সম্মান কি করে ?
 আপনি পৃথিবী-পতি, অধিকার-হিত
 এ অধীনী তব—যবে কোরেছে বিজীত
 জীবন, যৌবন, মন ; ছুঁখের কাহিনী
 কেন না চরণে তবে কবে এ ছুঁখিনী ?
 বলিও না, প্রাণেশ্বর ! হুঁরাশা আমার,—
 প্রাণেশ্বর বলিবার আছে অধিকার
 অধীনীর—বলিও না হুঁরাশা কখন !
 মনে করে দেখ, নাথ, হইবে স্মরণ
 সে দিনের কথা—যবে পিতার মদনে
 প্রার্থিলে দাসীর পাণি,—শুনিলে শ্রবণে,
 তদবধি হৃদে রূপ করিয়া ধারণ,
 মনে মনে তোমা দাসী করেছে বরণ !
 এখন গ্রহণ আসি করো প্রাণপতি ।
 পতি বিনা মতীর কি আছে আর গতি ?
 শুনিলে পিতার পত্রে স্বয়ংবর-কথা
 দাসীর, তাই কি নাথ; ভাবিয়া অন্যথা
 ক্রোধ করি নিমন্ত্রণ অগ্রাহ করিলে ?
 কিন্তু নাথ কি উপায় দাসীর ভাবিলে ?
 কারে লয়ে স্বয়ংবর ? সংযুক্তার বর
 কে আর ভুবনে, তোমা বিনা প্রাণেশ্বর ?
 জনক নির্দয় হ'য়ে কত কু-বচন
 বলিলেন :—অপরাধ,—ধরিয়া চরণ
 নিবেদিয়াছিল দাসী বরেছে তোমায়,
 মনে মনে,—এড়াইতে স্বয়ংবর দায় ।

ক্রোধে পিতা করেছেন স্থির অঙ্গীকার
 হর বিভা দিবে, নয় করিবে সংহার ।
 পরিণীতা ছুহিতার, পুনঃ বিভা দিতে
 পিতার এ বৃথা পণ, জীবন থাকিতে
 কে হবে সম্মত তায় ? জীয়েন্তে কখন
 করিব না স্বয়ংবর স্ত্রীর গমন ।
 অবশ্য ত্যজিতে প্রাণ প্রস্তুত এ দাসী,
 যদি না নিস্তার তার করো প্রভু আসি ।
 জনকের কাছে সত্য অপরাধী বটে—
 তাই ক্রোধ তাঁর,—কিন্তু তোমার নিকটে
 কোন দোষে দোষী দাসী ? কেন তবে তারে
 বিনা অপরাধে প্রভু, চাহ ত্যজিবারে ?
 শত্রু-কন্যা বলে কিবা কর অবিধ্বাস ?
 কহ নাথ, পোলমারি* করিলা কি ত্রাস
 বরিবারে পোলমীরে ? দেব পুণ্ডপতি
 করিলা কি অবিধ্বাস দম্ব-কন্যা প্রতি ?
 বল, প্রাণেশ্বর, আর শত্রু-কুল হ'তে
 রুক্ষিণীরে হুমিকেশ হরিলা কি মতে ?
 সিংহল-বিজয়ী বীর বঙ্গেশ নন্দন
 শত্রু কন্যা কুবানিরে করিতে বরণ,
 বিজয় কি আশঙ্কিলা ? বরঞ্চ তাহার
 সহায়ে কুমার রাজা হইল লঙ্কার ।—
 কত কব, প্রভু কিবা, তব অগোচর ।—
 চাহ যদি এ দাসীরে, হইয়া সস্তর
 এস স্বয়ংবর স্থলে,—দেখিবে সকলে
 সমাগত রাজগণ, দাসী কুতুহলে

* ইন্দ্র । পোলম অস্থরের কন্যা পোলমী অর্থাৎ শচীকে ইন্দ্র বিবাহ করেন ।

পূজিবে রাজীব পদ, জীবন-যৌবন
 বরমালা সহ দিয়া, করিবে বরণ ।
 বড় সাধ মনে,—পূর্ণ কর, হৃদয়েশ ।
 নতুবা দাসীর আশা এই হ'ল শেষ ।
 উদ্দেশে প্রণাম করি, ও কমল পায়,
 জনমের মত দাসী লইল বিদায় ।
 মনে রেখ, প্রাণনাথ । এই ভিক্ষা চাই ।—
 জন্মে জন্মে তোমা হেন পতি যেন পাই ।
 সরে না লেখনী, পাণি লিখিবে কি আর ।
 হে কান্ত, একান্ত দাসী

সংযুক্তা,

তোমার ॥

সমাপ্ত হইল পাঠ । নীরবিলা রায় ।
 একটা একটা কথা প্রবেশিয়া কায়
 বাজিল হৃদয় তন্ত্রে, চমকিল প্রাণ
 চমকে অশনি যেন পরশে পাশাণ ।
 খুলিল ভাবের দ্বার—আশার সঞ্চার
 আবার হইল মনে, অধুনা পারাবার
 উথলিল হৃদয়েতে ধরে না আহ্লাদ,
 বুঝিলা বিধাতা বুঝি পুরাইলা সাধ ।
 উদ্দেশে তাঁহার পদে প্রণাম করিয়া,
 মনে মনে মহীপতি মোহিত ভারিয়া
 সংযুক্তা হইবে লাভ, কল্পনা-নির্ভরে,
 আশার স্বপন কত দরশন করে,
 অধৈর্য্য অন্তর । কিন্তু করিয়া কেমন
 স্বয়ংবর সভা-স্থলে করেন গমন ?
 এই তো কনৌজ-রাজে করি অপমান,
 খেদাইলা দূতে তাঁর—হানি বাক্য-বাণ

তুচ্ছ কৈলা নিমগ্ন। পুনঃ কোন্ লাজে
 সাধিয়া যাবেন সেই স্বয়ংবর মাঝে ?
 কোন্ মুখে তাঁর আর বাড়াবেন মান
 সভামাঝে এই ঘাঁর কৈলা অপমান ?
 তথাপি সংযুক্তা আশা ছাড়া নাকি যায় !
 বিষম সমস্ত্রা মাঝে পাউলেন রায় !
 এক দিকে অহঙ্কার—চৌহান গৌরব,
 আর দিকে স্কুমার অমুরাগ নব ;
 উভয় বিরোধী বৃত্তি মিলে কি কখন ?
 ভাবিয়া উপায় কিছু না পান রাজন !
 ক্ষণেক চিন্তিয়া মনে সহসা উদিল
 ভাব—জ্ঞা বহু ভাব, ঈশ্বর হাসিল
 আশার পরশে মুখ—প্রভাত পূবন
 পরশে বিকাশে যথা সরোজ-বদন।
 সত্তরে চুধিয়া, লিপি যতনিয়া অতি
 রাখিলা লুকায়ে ছদে—যতনে যেমতি
 মহার্ব রতন দীন রাখে লুকাইয়া
 হৃদয় মাঝারে ! বীর শয্যা তেয়াগিয়া
 উঠিলা, পরিলা বেশ যোগ্যমত কার,
 ত্যজিয়া বিলাস-গৃহ, চলিলা সভায়। (ক্রমশঃ)

বাণিজ্য।

“বাণিজ্যে বশতে লক্ষ্মী” একটি প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু ইহা
 যে কেবল কথার কথা কে বলিবে? বাণিজ্যদ্বারা যে লক্ষ্মী প্রী হয়
 তাহার জাজ্ঞান্যমান দৃষ্টান্ত আমরা দিগের চক্ষের উপরে। প্রায় ২২০ বৎসর
 পূর্বে কয়েকটি ইংরাজবণিক বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষে আগমন
 করে, তাহারাই ভারতবর্ষে অধিকার করিল। ভারতবর্ষ বণিক ইংলণ্ডের

পদানত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যখন সুদিন ছিল, তখন ইহার অধিবাসীরা বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবশোত লইয়া বাণিজ্যার্থ নানাদেশে গমনাগমন করিত। হিন্দুদিগের চতুর্কর্ণের মধ্যে বৈশ্য অর্থাৎ বলিক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। দুঃশ্বেদ বিষয় এখন ভারতের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিবাসীগণ বাণিজ্যে বিমুগ্ধ হইয়াছে এবং সমুদ্র যাত্রা হিন্দুজাতির পক্ষে এককালে নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায় তুর্কদের অস্ত্রপাতী ফিনিসীয়া দেশের লোকেরা পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের রাজধানী টায়ার সর্বপ্রথমে “সমুদ্রের অধীশ্বরী” নাম ধারণ করে। ফিনিসীয় জাতি খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্বের বাণিজ্যোদ্দেশে ইংলও পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। ফিনিসীয়র পরে কার্থেজ বাণিজ্যদ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কার্থেজ ফিনিসীয়রই একটা উপনিবেশ এবং ইহা ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে এক সময় ভুবনবিজয়ী রোম মহানগরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল। রোমের চর্য্যানলে কার্থেজ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তৎপরে ইটালীর কয়েকটি নগর বাণিজ্য বা মায়ে জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠে। ইটালীর বিনিস নগরী কেবল বাণিজ্য-লব্ধ সম্রাট ও ধনাড়ুঘরে এক সময় সমুদ্রায় পৃথিবীকে পরাস্ত করিয়াছিল। জেনোয়া, হান্স প্রভৃতি আরো কয়েকটি নগরী ইহারই অনুসরণ করে। জেনোয়াবাসী ক্রুটকার কলঙ্কল অর্জ পৃথিবী আমেরিকা অধিকার করেন। এই কলঙ্কলেরই উত্তেজনার স্পেন ও পর্তুগালে সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হয় এবং দেশদেশান্তরে বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপ্ত হয়। স্পেন বাণিজ্য অপেক্ষা রাজ্য লাভেই অধিকতর সন্তোষ লাভ করিল, কিন্তু পর্তুগাল কেবল বাণিজ্যেই মনোমোগী হইল। এক সময় আটলান্টিক মহাসাগরের দূর হইতে ভারত মহাসাগরের পূর্বদিকস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত পর্তুগালের বাণিজ্য রাজ্য বিস্তারিত হইয়াছিল। ওলন্দাজেরা পর্তুগিজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে এবং তাহাদিগের দুইটাস্তে ইরাজাগণও বাণিজ্য পথে পদচারণা করিতে শিক্ষা করে। ইরাজজাতি বাণিজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষে অবতীর্ণ হইয়াও সকলকে পরাস্ত করিয়াছে এবং আটান টায়ার “সমুদ্রের অধীশ্বরী” বলিয়া

যে নামধারণ করিয়াছিল, তাহা এখন ইংলণ্ডের অধিকৃত হইয়াছে।

এতজন ইংরাজ ঐচ্ছিক ইংলণ্ডের বাণিজ্যোন্নতির এইরূপ বর্ণন করি-
তাহেনঃ—১৮১৫ সালের ২০ বৎসর পূর্ব অবধি সমুদায় পৃথিবীর বাণিজ্য
ইংলণ্ডের হস্তগত। ইংরাজেরা যে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী তাহা নহে,
তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক। পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির বাণিজ্যোপাত
একত্র করিয়া সংখ্যায় যত হয়, এক ইংরাজজাতির তাহার তিনগুন।

ইংরাজেরা দূরবর্তী দেশ সকলের সহিত কেবল বাণিজ্য করিয়া নিরস্ত
হয় নাই, তাহারা পৃথিবীর সর্বত্র বাণিজ্য সহকারী উপনিবেশ বা কুঠী
সংস্থাপন করিয়াছে। (১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আশিয়ার বাণিজ্য
একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। (২) রাষ্ট্র অথ ইংলণ্ড লোণা রূপা ও মণির
কারবার করিয়া থাকে। (৩) ইডমন্ড কোম্পানি ইডমন্ড প্রদেশ হইতে
পশ্চিমোত্তর বাণিজ্য করে। এতদ্ভিন্ন তুর্কি, কমিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ
সমুদ্র কোম্পানি আর সুদূর অবস্থায় আছে।

গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের অন্তর্বাণিজ্য রেলওয়ে, শকট, এবং জল-
যানদ্বারা সম্পন্ন হয়। নদী ও খাল দেশের প্রায় সর্বত্র প্রসারিত আছে,
তদ্বারা এবং সমুদ্রের কিনারা দিয়া অনেক নৌকা যাতায়াত করে এবং
এক স্থানের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য অন্য স্থানে বহন করে।

ইংলণ্ড যেমন মানাদেশে নানা প্রকার দ্রব্য রপ্তানি করে, তেমনি ভিন্ন ২
দেশহইতে স্বদেশে নানাবিধ দ্রব্য আমদানি করিয়া থাকে। ইংলণ্ড
কমিয়া হইতে মণ, আলকাতরা ও ঘোম; সুইডেন হইতে তাম্র; নরওয়ে
হইতে বাহাদুরী কাষ্ঠ, জার্মানি হইতে কাপড় ও কাগজের মাল মসলা; ফ্রান্স
ও পোর্টুগাল হইতে মদ্য, স্পেন হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ফল; ইটালী হইতে
রেশম, তৈল ও ফল; তুর্কি হইতে রেশম, ঔষধ, তৈল ও কাফি স্বদেশোৎ-
পন্ন দ্রব্যজাতের ভিন্নবিধে আনিয়া থাকে। নিরীক্সবাদ সময়ে আমদানী
ও রপ্তানি কার্যে ইংলণ্ডের ৩৫০০০ জাহাজ এবং ২ লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে।
এতদ্ভিন্ন বাণিজ্য ও শিল্প ব্যবসারে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের ৩০। ৭০
লক্ষ লোক ব্যক্তিহইতেছে।

লণ্ডন প্রধান বন্দর। ইহা একা বাণিজ্য আর সমুদায় বন্দরের সমতুল্য।

লণ্ডন ছাড়া লিবারপুল, ব্রিস্টল, গ্লাসগো, হুগ, কলমাউথ, লিন, প্রাইমাউথ, ইন্নার মাউথ, ডার্টমাউথ, সিলভিস লিথ, আবার্ভিন, কোয়াইট হেবেল, সোয়ানসি, ডবলিন, কর্ক এবং ওয়াটার ফোর্ড এই কয়েকটি বন্দর আছে।

ব্রিটিশ দ্বীপের যে যে নগরে যে যে শিল্পজাত প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ এই—অস্ত্র শস্ত্র এবং ধাতু ত্রবা বার্মিংহাম, উলবস্ত্রামটন এবং সেকিল্ডে; কালিকো ও কাপাস বস্ত্র মাকেস্টার, ফকপোর্ট, বোল্টন এবং পেমলিতে; পশমী কাপড় লিড্‌স এবং নরউইচে, লোডার পোষাক নটিংহাম ও লিফোর্ডে, পট্টবস্ত্র বেলফাষ্ট এবং লণ্ডনডেরীতে; কার্পেট বস্ত্র হালিফাক্স উইলটন এবং ফিডারমিনিস্টারে; চিনির বাসন এবং কাচের ত্রবা নিউকাসল ও উইয়ারে।

ইংলণ্ডের নীচে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস বাবিলের জন্য বিখ্যাত। আমেরিকা যেরূপ বৃহৎ ২ জাহাজ নির্মাণ করিতেছে, পৃথিবীর সকল ভাগে গমনাগমন করিতেছে, এবং স্বাধীন ও স্বেচ্ছাশাসনে শান্তি লাভ করিয়া স্থখ সমৃদ্ধিতে উন্নত হইতেছে, তাহাতে ইহা বাণিজ্য ব্যাপারে অচিরে ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা।

আমিরার মধ্যে বাণিজ্য অংশে চীন সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহার বৃহৎ খাল সকল এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে।

গ্রেট ব্রিটেনের বার্ষিক আমদানী ৭০ কোটি টাকার অধিক হইয়া থাকে, রপ্তানিও ততুল্য। বাণিজ্যোপযোগী ৮০ কোটি টাকার ত্রবা ইহাতে মজুত থাকে। জাহাজাদির ব্যয় ৪০ কোটি টাকা।

স্পেন, তুরস্ক, ইটালী, জর্জিয়া, জর্জি, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া, আমেরিকা, ব্রাজিল এবং আফ্রিকার বহিঃকরাই পৃথিবী মধ্যে এক্ষণে সর্বপ্রধান।

শ্রীশিক্ষার ফলাফল।

বঙ্গীয় স্রীশমাজে যেরূপ বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা অল্পকালের মধ্যে যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছেন ভারতবর্ষের কোন স্থানে এ প্রকার দৃষ্ট হয় না। বোধহয় অঞ্চলের স্রীলোকেরা যদিও স্বাধীন ভাবে প্রকাশাক্রমে যথা তদা

বিস্তার করেন, অবগুণ্ঠনবন্তী হইয়া অস্ত্রপুরে বদ্ধ থাকেন না, কিন্তু তাঁহাদের অজ্ঞানতা কুসংস্কার এদেশীয় মহিলাদের অপেক্ষা অধিকতর কোথহয়। বঙ্গ ভূমি নারীগণের শিক্ষার জন্য অতি অল্পই উদ্যোগ করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা শুনে শিক্ষা কার্য আপনা হইতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিদ্যালয়কে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাব্যাক্ত ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে, বঙ্গবাসীদিগের অস্ত্রপুরের অন্ধকার পূর্বের মত আর তত গাঢ়তর বোধ হয় না। অল্পবয়স্ক বালিকারা অতি সহজে পাঠ্যবিষয় সকল বুঝিতে এবং কণ্ঠস্থ করিতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার প্রথমাবস্থা দর্শন করিলে দেশহিতৈষীদিগের মনে বিপুল আশঙ্কের সঞ্চার হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিবাহের পূর্বে অর্থাৎ দশ বার বৎসর বয়সক্রমে পর্যন্ত যেরূপ ক্ষুদ্র গতিতে শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করে, তাহা বাস্তবিকই নিতান্ত আশাজনক। কিন্তু এ প্রকার উন্নতি কিছু দিন পর্যন্ত, তাহার পর আর থাকেনা। জ্ঞানের গাঢ়তা জন্মিতে পারেনা, তুতরাং স্ত্রী চরিত্রে সারবত্তা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। একটা সময় আছে, যখন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান বালকদিগের সঙ্গে অনেকানেক বুদ্ধিমতী বালিকার তুলনা করা যায়, বরং কোন কোন বিষয়ে বালিকাদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি আদিক উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু যেমন বুদ্ধি তেমনি হ্রাস, ১৫১৬ বৎসরের ৬ দিকে আর সে তেজস্বিতা প্রায় থাকেনা। এক দিন এই পত্রিকার সমুদায় ভাষা বাগানের স্বারা নির্বাহিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সমুদায় দূরে না বাড়ক মাসান্তে ইহার এক চতুর্থাংশও রামায়চনার পূর্ণ হয় না। প্রথম প্রথমে এবি-
 য়ে অনেকের উৎসাহ দেখা যাইত, তাঁহারা গদ্য পদ্যো নানা প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। যে বয়সে তাঁহাদের লেখনী হইতে উৎকৃষ্ট সরস এবং সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল বাহির হইবার কথা, যে বয়সে তাঁহারা মাতা হইয়া, ঘরের 'নিষি' হইয়া সংসারের অকূল চিন্তা সাগরে একবারে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহাদের রচনাবলী ক্রমে পরিপক্ব হইয়া উঠিতেছে, আমরা মনে করিতাম, তাঁহারা এখন লেখা পড়া একবারে ডুবিয়াগেলেন কি না কিছুই বুঝা যাইতেছেন। উচ্চ ভাবের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিব কি নিজেরা একখান সংবাদপত্র চালাইব, কি দেশের অশিক্ষিতা নারীদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দিব, তাঁহাদের ভ্রম কুসংস্কার অজ্ঞতা যাহাতে যায় তাহা করিব এ প্রকার উচ্চতর সদভিপ্রার প্রায় কোন নারী-

রই দেখিতে পাওয়া যায় না। নারী সমাজের নেতার উচ্চ আসন কত দিন হইতে শূন্য হইয়া রহিয়াছে অথচ একটা আত্মীয় এমন দেখিলাম না যিনি স্বজাতির উন্নতি করে আর সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বাহারা এই অভাব কতক পরিমাণে পূর্ণ করিতে পারিতেন তাঁহারা সন্তানবতী হইয়া, আশা অভিল্যাস সকল ছাড়িয়া দিয়া নিরুৎসাহ চিত্তে বৃদ্ধার ন্যায় কালক্ষেপণ করিতেছেন। যাঁহাদের এখন বয়স আছে, শিক্ষা কার্য চলিতেছে তাঁহাদের মধ্যে বা এমন সুলক্ষণাক্রান্ত নারী কে আছেন যিনি নারীকূলের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন? কিছু ইংরাজি, কিছু পিয়ানো বাদ্য, একটু কারপেট বুনান এইরূপ অসার শিক্ষা লাভ করিয়া দশকর্ম্মাধিতা হইবার জন্যই প্রায় সকলে ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহাদের নিকট অধিক কিছুই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। উচ্চদরের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিতা মহিলা হইয়া, দেশের উপকার করিব, ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইব এপ্রকার উচ্চ সঙ্কল্প কাহার মনে স্থান লাভ করে নাই। কোন রূপে ডব-দাগর পার হইয়া যাইতে পারিলেই হইল এইটা সকলের আন্তরিক ইচ্ছা। নারীরা যে পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, সে পরিমাণে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও চিন্তা-শক্তির পরিমার্জিত হয় নাই। সামান্য অগভীর বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বুদ্ধি চাহুর্য প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু গভীর এবং উচ্চ বিষয়ে সে ভার লক্ষিত হয় না। যাঁহাদিগকে আমরা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিতা বলিয়া গমন্য করি, তাঁহাদের গভীরতা এবং সারবত্তা অতি অল্প কেবল তাহা নহে, সে বিষয়ে উৎসাহ উদ্যম অহুরাগ অধাবসায়েরও অভ্যস্ত অভাব। অতএব বর্তমান শিক্ষা প্রণালী একটিকে যেমন উন্নত এবং গভীর স্ত্রী চরিত্র সংগঠনে অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে, তেমনি অপর দিকে অসার শিক্ষা দ্বারা কতকগুলি বিষয়ে অনিষ্টোৎপাদনও করিয়াছে এবং শিক্ষিতা মহিলাদিগকে বোর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে। যেখানে বিদ্যার আলোকে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে কুসংস্কার এবং পুরাতন শাসন বিধি আর পুঙ্কের না বতত প্রবল নাই, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধর্মবন্ধনও শিথিল হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিদ্যার আপাদন পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দু কুলবালাদিগের ন্যায় ধর্ম শাসন মানিতে পারেন না, মত সংগ্রহেও তাঁহাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, সভ্যতার সুবকর উপাদান সকল উপভোগেও সম্পূর্ণ ইচ্ছা অন্নিয়াছে, ইহার পরিণাম কিরূপ বিষময়, তাহা আর বলিবার

প্রয়োজন রাখেনা। শিক্ষিতা কুসংস্কারবিহীন নারীগণ এখন উভয় সঙ্কটের অবস্থার পতিত হইয়াছেন। ঘোমটা দিয়া ঘরের কোণে দিন রাত্রি সুকাইয়াও থাকিতে পারেন না, আবার অনাবৃত মুখে স্বাধীন ভাবে যথা তথা ভ্রমণ করিতেও পারেন না। গাড়ী পালকীর দ্বার বন্ধ করাও কষ্টকর, আবার তাহা খুলিবার সাধ্যও নাই। নূতন সভ্য পরিচ্ছদ এবং পাতুকা ব্যবহার না করিলে মান মর্যাদা লজ্জা সন্ত্রম থাকে না, আবার তাহা সর্বত্র ব্যবহার করাও মহা বিপদের কারণ। স্বামীর পরিচিত অসভ্য বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপ করা আবশ্যিক, অথচ করিলেও লোক গল্পনা সহ্য করিতে হয়। পুরাতন হিন্দু দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, তথাপি লোক ভয়ে তাহাদিগকে মান্য করিতে হইতেছে, এতদ্ব্যতিরিক্ত কালের বিধবারা আর নিরামিব ভোজী হইয়া একাদশি বা নির্জলা উপবাস করিতে চান না, ব্রত ধর্ম প্রাচীন রীতি নীতির উপর ও তাহাদের কোন আস্থা নাই, এরূপ অবস্থায় মনের ভাব কিরূপ থাকে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এসমস্ত দোষ সামাজিক আন্দোলন ও নূতন পরিবর্তনের কালে অপরিহার্য্য তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যদি একদিকে আশঙ্করূপ স্ফুল প্রসূত হয়, তবে ইহা অনায়াসে সহ্য করা যাইতে পারে। অশিক্ষিত নারীসমাজের যেমন শোচনীয় অবস্থা, অল্পশিক্ষিত শিখিল স্বভাব বুঝতীদিগের অবস্থা তদপেক্ষা অধিক প্রীতিকর বোধ হয় না। এক্ষণে যদি রমণীগণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া চরিত্রকে উন্নত এবং স্বভাবকে চিন্তাশীল করিতে পারেন তবে এই অভাব শীঘ্রই বিদূরিত হইতে পারে। উৎসাহ উদ্যম বিহীন বুদ্ধিমত্তী পার্টিকাগণ উৎসাহিত হউন এবং নিজেদের ও স্বজাতির উন্নতিসাধনে জীবনকে উৎসর্গ করুন, এই আমাদের অনুরোধ।

অজ্ঞারক বাষ্প।

তৈল কি বাতীর সাহায্যে লোকে চিরকাল আলোক জ্বালিয়া থাকে। কিন্তু এখন কল কৌশল লইয়া সকল কাণ্ড, তৈল ও বাতী খরচ না করিয়াও লোকে অপরূপ আলোক উৎপাদন করিতেছে। কলিকাতার গ্যাসলাইট বা গ্যাসের আলোক জ্বালিয়া থাকে, ইহা আমাদের পার্টিকাগণের অনেকেই

দেখিয়াছেন। ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতেও সহর যেন জ্যোৎস্নাময় হইয়াছে। কোন প্রশস্ত রাজবস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিলে রজনী যেন চন্দ্রকান্ত মন্দির হার পরিয়াছে বোধ হয়। গড়ের মাঠে একবার দাঁড়াইয়া চারিদিক্ পানে চাহিলে যেন মর্ত্যলোকে অমর্যবতী অবতীর্ণ হইয়াছে বোধ হয়। কিন্তু পাঠিকাগণ শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন, যে যে গ্যাস জলে, তাহা আর কিছু নয়, মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লার ধোঁয়া মাত্র, ইংরাজীতে ইহাকে 'coal gas' বলে, আমরা অঙ্গারক বাষ্প বলিতেছি।

গ্যাস বা ধোঁয়া যে জলিয়া থাকে, এ কথাই কেহ আশ্চর্য্য প্রকাশ করিবেন না। সকলেই ইহা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ধুনার বা পাকাটীর ধোঁয়ার একটা জলন্ত পলিতা ধরিলে তাহা জলিয়া উঠে। যাহারা পাড়াগাঁর থাকেন, তাহারা পাঁকপুকুরে গ্যাস লাইটের পরীক্ষা অতি সহজে করিতে পারেন। একটা ঘটা কি কলসী উপড় করিয়া ও তাহার মুখে একখানি গামছা দিয়া কিছুক্ষণ পাঁকের মধ্যে নাড়িতে চাড়িতে হয়, তাহাহইলে ঘটা বা কলসী লঘু কারবরেটেড হাইড্রজেন বা অঙ্গারক জলজন বাষ্পে পূর্ণ হয়। ঘটা বা কলসী তখন তুলিয়া ও গামছা সরাইয়া ফেলিয়া তাহার উপর একটা জলন্ত পলিতা ধরিলেই বাষ্পের আলোক দৃশ্য করিয়া জলিতে থাকিবে।

পাঁকপুকুরে লঘু অঙ্গারক জলজন বাষ্প পাওয়া যায়; কয়লা হইতে অ অঙ্গারক জলজন প্রস্তুত করা যায়, ইহাই নলের মধ্যদিয়া সহরময় দিয়া চারিদিকে এত উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। এফণে অঙ্গারক বাষ্প বা কোল গ্যাস কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে।

ঢালাই লৌহের নলের ভিতর মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লা অগ্নির তাপে উত্তপ্ত করিলে অঙ্গারক বাষ্প জন্মে। এই বাষ্প প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক গুণি অর্কগোলাকার লৌহময় আধারে পাথুরিয়া কয়লা পূর্ণ করা হয় এবং একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া সেইগুলি উত্তপ্ত করা হয়। এই উত্তাপের তারতম্য অনুসারে বাষ্পের জলিবার ক্ষমতার ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। কুল কাঠের অঙ্গারের মত উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত বাষ্প উৎপন্ন হয়, নতুবা তাহার সহিত অনেক অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ঐ সকল পদার্থ বাষ্প ঘাইবার নলের ভিতর

জমিয়া যায় এবং তদ্বারা বাষ্পের গতি অবরুদ্ধ হয়। আবার অধির উত্তাপ অধিক হইলেও ফল দর্শে না। অধিক উত্তাপে সমুদায় অঙ্গারক ভাগ লৌহাধারের গায় লাগিয়া থাকে এবং তদ্ব্যতীত যে বাষ্প উথিত হয়, তাহার আলোকন শক্তি নিস্তেজ হয়। ইতিপূর্বে একটা প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি, বাতী ও তৈল যে জলে, কেবল বাষ্পীয় পদার্থ হইয়া তাহা জলে না, বাষ্পের সঙ্গে যন পদার্থ থাকিতেই আলোকের উজ্জ্বলতা হয়। সুস্থ অঙ্গার কণা ব্যতীত গ্যাসের আলোর উজ্জ্বলতা হইতে পারে না।

প্রবল উত্তাপে করলা সকল দগ্ন হইলে কোক বা পোড়া করলা লৌহাধার গুলির মধ্যে পড়িয়া থাকে এবং করলা হইতে প্রায় ১২ প্রকার বাষ্প ও বিবিধ তৈল পদার্থ বাহির হইয়া আর একটা পাত্রে সংগৃহীত হয়। এই পাত্রের বোল অভ্যন্তর বৃহৎ এবং অর্দ্ধজল পূর্ণ। প্রত্যেক লৌহাধার হইতে এক একটা নল আসিয়া এই বৃহৎ পাত্রের জলে মগ্ন থাকে। এই পাত্রের নাম “Hydraulic main” বা বৃহৎ পাত্র জলাধার। লৌহাধার হইতে যে মিশ্রিত বাষ্পাদি পদার্থ উথিত হয়, তাহা এই বৃহৎপাত্রে আসিয়া ইহার জলের সহিত মিশিয়া বা জমিয়া যায়। জলমিশ্রিত এই পদার্থ আলকাতরা হয় এবং যে বাষ্প জলে মিশ্রিত না হয়, তাহা বাষ্পাকারে উঠিয়া বৃহৎপাত্রের অপারদ্ব পূর্ণ করে। আলকাতরা করলার বাষ্পের রস যাত্র, তাহা একত্রে জমিলে ঐ পাত্র হইতে একটা স্বতন্ত্র আধারে নির্গত হয়। আলকাতরা গিয়া যে অঙ্গারক বাষ্প থাকে, তাহা condenser বা বাষ্প জমাইবার কতকগুলি নলের মধ্যে প্রবেশ করে। এই নলগুলি সরু সরু ও সরল, কেবল শেষ ভাগে কিঞ্চিৎ স্থল্মাগ্র হইয়া বক্র। এই নলগুলি লম্বভাবে অবস্থিত। উপরিস্থিত একটা বৃহৎপাত্র হইতে জল নিঃসৃত হইয়া এই নলগুলিকে শীতল রাখে। এই বক্রমুগ্ন নলগুলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে গ্যাস শীতল হইয়া আইসে। এই বাষ্প পরে purifier বা বিশোধক নামে কতকগুলি নলে প্রবিষ্ট হয়। গ্যাস বিশোধনের নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বর্তমান প্রচলিত ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এই—অনেকগুলি পেতেনের উপর ভিত্তি করাতের গুঁড়া ও এক প্রকার আকরিক লৌহ মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়। উহার সহিত কলিচূর্ণও মিশ্রিত হইয়া থাকে। বাষ্প এই পেতেন

গুলির উপর দিয়া যেমন যায়, অঙ্গারক দ্রাবক, গন্ধক ও জলচেন, গন্ধক, আমোনিয়া প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ ইহা হইতে পরিত্যক্ত হয়। এরূপে বিশোধিত হইলেও অঙ্গার ও গন্ধকের একটা যৌগিক পদার্থ গ্যাসের সহিত মিশ্রিত থাকে। ইহা বিদূরিত করিবার একটা উপায় আছে বটে, কিন্তু তাহা সচরাচর অবলম্বন করা হয় না। এই যৌগিক পদার্থ গ্যাসের ভিতর থাকিতে গ্যাসের আলোকে আলোকিত গৃহে বৃক্ষাদি জীবিত থাকিতে পারে না। যাহা হউক উপরিউক্ত উপায় সকল দ্বারা বিশোধিত অঙ্গারক বাষ্প বাষ্পমান নামক এক বৃহৎ আধারে সঞ্চিত হয়। কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গার এবং হাবড়ার টেসনের নিকটে যে এক একটা খুঁটিদিয়া ঘেরা উচ্চ গোলাকার গৃহ দেখা যায়, তাহাই বাষ্পমান যন্ত্রালয়। বাঁহার লক্ষ্য করিয়া দেখেন দেখিতে পান ঐ গোলবরের মধ্যে যে একটা বৃহৎ ঢাকুনী থাকে, তাহা সন্ধ্যাকালে খুঁটির মাথা সমান উচ্চ থাকে, কিন্তু প্রাতে অর্ধেকেরও নীচে গিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই, বাষ্পমান যন্ত্রের মধ্যে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বাষ্প সঞ্চিত হয়, সন্ধ্যার পর গ্যাস পুড়িতে আরম্ভ হয়, হুতরাং ঢাকুনী নিয় হইয়া পড়ে। এই বাষ্পমান যন্ত্রের গ্যাস নল দ্বারা সহরের নানা অংশে বিতরিত হয়। কোথায় কত বাষ্প যায়, তাহা মাপিবরও উপায় আছে। ১ টন অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণ উত্তম কয়লাতে দীর্ঘে প্রস্থে ও উর্ধ্বে প্রত্যেক দিকে ২২৫০ ফিট পঙ্গিত বাষ্প উৎপন্ন হইতে পারে অর্থাৎ এক মন কয়লাতে ঘন ১২৫০ ফিট গ্যাস হয়। এক লণ্ডন নগরকে বাষ্পালোকে আলোকিত করিবার জন্য বৎসরে ১০ লক্ষ টনের অধিক কয়লা লাগে।

মাতার উচ্চপদ।

একটা নবজন্মিত বৃক্ষকে পোষণ করিয়া অবিকৃত ভাবে রক্ষা করা এবং তাহাকে তজ্জাতীয় বৃক্ষ মধ্যে সতেজ, পুষ্ট এবং উৎকৃষ্ট করা যে সে উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞের কার্য্য নহে। একটা নূতন সংস্থাপিত রাজ্যকে ধন ধান্যে সমৃদ্ধ করা এবং তাহার নবীনতর অধিবাসীগণের সুখস্বাস্ত্য বর্দ্ধন করা যে সে সমাজ নীতিজ্ঞের কার্য্য নহে। একটা মবজাত শিশুকে উপযুক্তরূপে পালন করাও

যে সে মাতার কার্য্য নহে। শিশুপালনের সহিত বৃক্ষপালনের কোন তুলনাই হইতে পারে না। নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যপালন আপাততঃ দেখিতে শিশুপালন অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। সমাজ-নীতিজ্ঞ যে সকল উপাদান লইয়া কার্য্য করিবেন, তাহা তাঁহার হস্তে অন্যত্র হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তিনি স্বয়ং প্রস্তুত করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ লোক হউন না কেন, যদি মনুষ্য প্রকৃতি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান থাকে, এবং নিজের চরিত্রের উপর একটুকু শাসন থাকে অর্থাৎ তিনি লৌকিক পাপ সকল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলেই হইল। মাতার সম্বন্ধে তাহা নহে। তিনি শিশুকে চৈতন্য অচেতন উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় লাভ করিয়াছেন। শিশু কি প্রকার প্রকৃতিও উপাদান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা তিনি কিছুই জানেন না। শিশুতে যেরূপ উপাদানই থাকুক না কেন, তাহার বিকাশ ও বিনাশ উভয়ই তাঁহার হস্তে নিহিত। ক্রমশঃ শিশুর চৈতন্য শক্তির উদ্ভবের সঙ্গেই তাঁহাকে এরূপ সাবধানে চলিতে হইবে যে উৎকৃষ্ট উপাদান গুলি উৎকর্ষ লাভ করে এবং অপকৃষ্ট উপাদান গুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। এ কার্য্য কাহার দ্বারা সম্ভব? যে অনেক পুস্তকপাঠ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, গণিত ও জ্যোতিষে পারদর্শী হইয়াছে, অথবা শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং দর্শন সমূহ যাহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাহারই দ্বারা? কখনই নহে। নব্যকুরিত শিশুর মন গণিত দ্বারা গণনীয় নহে, নক্ষত্র রাজির স্থিতিগতি দ্বারা নির্ণেয় নহে, পরিপাক মনের আলোচনা নিম্পন্ন মনস্তত্ত্বের বিষয় নহে, যুক্তি তর্ক দ্বারা আয়ত্ত করিবার নহে। ষাঁহারাই এই সকল উপায়ে শিশুর মানস কলিকা প্রস্ফুটিত করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

গণিতজ্ঞ, জ্যোতিষজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিৎ, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতি হইতে মাতাতে উচ্চতরগুণ না থাকিলে, তিনি এই গুরুতর কার্য্য কখনই সম্পাদন করিতে পারেন না। যেখানে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে থাকিয়া কৰ্ম্ম করিতে হইবে, একটু অধীর না হইয়া সেই অন্ধকার মধ্য হইতে যে কিছু ক্ষীণ আলোক প্রকাশ পায়, তাঁহারই অনুসরণ করিতে হইবে, নিজের আচরণ এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হইবে যে তদ্বারা ঐ সকল ক্রমশঃ বিকশিত মানসিক শক্তি বিনষ্ট বা বিপথে নীত না হয়, সেখানে যথোপযুক্ত নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা মনুষ্যবুদ্ধির

অনায়ত্ত বলিলেও বলা যাইতে পারে। ষ্টির, শান্ত, মহিষ, সংযতেন্দ্রিয়, সংযতমনা, অভিজ্ঞ এবং সত্য ন্যায় ও স্নেহের অবতার না হইলে কে এই গুরুতর কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে? কিন্তু এমন কে আছে যে এই সকল গুণে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে? অপূর্ণ মনুষ্যে ইহা কি সম্ভব? অথচ মনুষ্য সমাজ মাতার নিকটে এই সকল গুণের প্রত্যাশা করে। যে পরিমাণে তিনি এই সকল গুণের আধার হয়েন, সেই পরিমাণে তিনি মনুষ্য সমাজে উচ্চতর সিংহাসন অধিকার করেন। মনুষ্য সমাজের অনায়ত্ত গুণে যখন চিরদিন মাতাকে উন্নত হইতে হইবে, তখন রাজা, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্মোপদেশী সকলেরই মস্তক মাতার নিকট চিরকাল অবনত থাকিবে। সংসার মুখ্যতাবশতঃ মাতৃপদকে তুচ্ছ করিয়া সামাজিক উচ্চ পদ সকলকে গৌরবান্বিত মনে করে, স্ত্রী জাতিও নিজ কৰ্ম্মকে যৎসামান্য মনে করিয়া আত্মবিস্ময় করে, কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যে দিন মাতার উচ্চতর স্বীকৃত হইয়া সম্রাটের সহিত তাহা তুল্যতাকে অর্পণ করা হইবে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, একটী দৃষ্টান্ত না দিলে উহার গুরুত্ব অস্বীকৃত হওয়া সুকঠিন। আমরা সর্বদা দেখিতে পাউ একটী শিশু যাহাকে প্রথমাবস্থায় অতি শান্ত ও গভীর দেখিয়াছিলাম, যতই দিন ২ তাহার বয়োবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, সেই সকল সদগুণ তিরোহিত হইতে লাগিল। বালকটী নিতান্ত হৃদ্যন্ত ও চঞ্চল হইল, বাধ্যতার স্থলে অবাধ্যতা আসিয়া অধিকার করিল, একে ২ সকল সদগুণগুলি বিলুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল। আশ্রয়দায় গোপন, লোভবশতঃ পরদ্রব্য বলপূর্ব্বক বা গোপনে গ্রহণ ইত্যাদি মাতা পিতার সন্তাপজনক ছুগুণগুলি তাহার নবাবু রিত মনে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মাতার মন যতই এই সকল ছুগুণ দেখিয়া বিরক্ত হইতে লাগিল, যতই তিনি তাহাকে কঠোর শাসন দ্বারা নিজের আয়ত্ত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, ততই সে আরো অবাধ্য হইতে লাগিল। মাতাকে বিরক্ত করিতেই যেন তখন তাহার আত্মলাভ হয়, অনেক সময় তাহার আচরণে এই ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। অস্বাভিক প্রায় সকল সময়েই এই প্রকার পরিবর্তন প্রথমাবস্থায় লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সময়ে যদি বীর শান্ত ও সংযতমনা হইয়া স্নেহ ও ন্যায় ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সন্তানকে প্রকৃত-

পক্ষে যত্ন করা না যায়, এই সকল সাময়িক দোষ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া, তাহার চরিত্রের সমধিক স্থান অধিকার করিয়া বসে এবং বাল্যকালে যাহা বালস্বভাব-সুলভ চপলতা ছিল, তাহাই পরিপক্ব বয়সের স্থির চরিত্র হইয়া যায়।

আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি, একটা শিশুসন্তানকে মনুষ্য করিয়া তুলিতে মাতার কতগুলির প্রয়োজন। রাজা দণ্ড দিলেন, অপরাধীর চরিত্র সংশোধন হইল কি না সংবাদ লইলেন না। রাজা সংবাদ লইয়াই বা কি করিবেন? মাতার দোষ যে সন্তানের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাহার সাধ্য তাহা উৎপাটন করিতে পারে? রাজা ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু মাতার ক্ষান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। একেত সন্তানের সহিত অতি মেহের সম্বন্ধ, তাহাতে তাহাকে আবার গর্ভে ধারণ করিয়া সমাজের নিকটেও দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের নিকটেই তিনি দায়ী। অন্যে নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে উপেক্ষা করিতে পারে, বৃথা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যনার হৃদয়-বিকাশ তুচ্ছ মনে করিয়া তৎপ্রতি ঔদাস্য করিতে পারে। কিন্তু মাতার তাহা করিবার উপায় নাই। চিরজীবন নিজ চরিত্রের ক্রমোৎকর্ষ সাধন করা, ছন্দকে সর্ব প্রঘরে রক্ষা করিবার জন্য যেহাদিতে ভূষিত করা তাঁহার প্রধান কর্তব্য। তাঁহাকে ন্যায়ের কঠোরতা দ্বারা মধুরতা দ্বারা মধুর করিয়া লইতে হইবে, অপ্রিয় শব্দকে প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে, স্বর্ঘ্যের তেজস্বিতার সহিত চন্দ্রের স্নিগ্ধতার যোগ করিয়া দিতে হইবে, সমুদ্রার সমৃদ্ধ ও মুহূৰ্ত্ত সবেও বিবেকে তাহার ভূষণ করিতে হইবে। এইরূপ করিবার কারণ এই, মাতা আপনার চরিত্রকে আদর্শ স্বরূপ করিয়া তুলিতে না পারিলে কখনই সন্তানের চরিত্র সংগঠনে কৃতকার্য হইতে পারেন না।

জীজ্ঞাসিত শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা গণের মত কি, যাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমরা মনে করি জীজ্ঞাসিত উচ্চতর শিক্ষার আদর্শ চরিত্রগঠন। নিম্নভূমির শিক্ষা যে পরিমাণে এই উচ্চতর শিক্ষার সহায়তা করিতে পারে, তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহা ততটুকু প্রয়োজনীয়। একজন স্ত্রী যদি সমুদ্রার জীবন গণিতে দর্শনে বিজ্ঞানে বা সাহিত্যে নিয়োগ করেন, অথচ তাঁহার স্বপদোপযোগী উচ্চ শিক্ষা লাভ না হয় আমরা বলিব তাঁহার জীবন অনেকটা বিফলে অতিবাহিত হইল। তিনি যে জন্যে সমাজে সর্বোচ্চ

সিংহাসন লাভের অধিকারিনী, যদি তাহাই না হইল, তবে আর বুঝা জ্ঞান গর্বে ক্ষীণ হইয়া লাভ কি? মূৰ্খতা তাহার পক্ষে প্রেরণকর ছিল, কেন না তিনি মূৰ্খতার দোহাই দিয়া বরং অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন।

আশ্চর্য্য শিল্পকৌশল।

মহুয়া যন্ত্র সকলকে আশ্চর্য্য কৌশলে গতিশক্তিবিশিষ্ট করিয়া সাধারণ লোককে যেরূপ মোহিত ও বিম্বিত করিয়াছেন, তাহার ব্রহ্মান্ত আমরা ইতিপূর্বে বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু মহুযোর বুদ্ধির খেলা এইখানেই শেষ হয় নাই। যন্ত্র হইতে মহুযোর কণ্ঠধ্বনি উৎপাদন করিবার জন্য শিল্পিগণ বহুকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য ৩০০০ বৎসর পূর্বে মিশরে মেফিস নামক এক দেবমূর্তি গঠিত হয়, তাহার মুখ হইতে আশ্চর্য্য সঙ্গীত হইত। প্রাচীন গ্রীশের ডেলফিতে যে দৈববাণী হইত, তাহাও এইরূপ কৌশলের ফ্রিয়া সম্ভেদ নাই। খৃষ্টীয় ১০ শতাব্দীর শেষে রোমের এক ধর্ম্মাধ্যক্ষ বাকশক্তিবিশিষ্ট একটি যুগ্ম সংগঠিত করেন। তৎপরে রজার বেকন এবং আলবিরিয়স মাইনস যন্ত্র মুখ হইতে মানবীয় ভাষা নিঃসৃত করিবার জন্য বিস্তর কৌশল প্রকাশ করেন। মেফিস্ মূর্তির নিশ্চিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফেলকি দৈববাণীস্থলে মন্দিরের গঠনে চাতুরী ছিল। মহুয়া যন্ত্রের বাগ্‌যন্ত্র সকলের উপরিভাগে মুখের কেবল একটি মাত্র আকার থাকিত, ভিতরে বাদ্য যন্ত্রের নল প্রভৃতি ঢাকা থাকিত। এরূপ মুখ দ্বারা অতি অল্প সংখ্যক সামান্য শব্দ মাত্র নিষ্কৃত হইত।

মহুয়াযন্ত্রের অনুসরণে বাদ্যযন্ত্র হইতে সুর নিঃসারণ বর্ত্তমানকালীন শিল্পিদিগের কৌশলেই সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও সম্বন্ধে যিনি যত যত্বে নির্মাণ করিয়াছেন, কেহই বেডেনের ফুইবর্গ নিবাসী ফেবারের মত কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। এই ব্যক্তি প্রথমে ভিয়েনার পর্য্যবেক্ষিকার এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন, চক্ষুপীড়া হওয়াতে বৃত্তি লইয়া শারীরতত্ত্ব অধ্যয়নে জীবন উৎসর্গ করেন। এই অধ্যয়নের ফলে আশ্চর্য্য বাক্যযন্ত্র নির্মাণ করিয়া জগৎকে চমকিত করেন। তিনি রবার দ্বারা কণ্ঠনালী, জিহ্বা এবং নাসিকা

নির্মাণ করেন এবং কৃতকগুলি কি অর্থাৎ চারি তাহার সহিত সজ্জিত করেন। 'কি' সকলের সহিত একটী প্রিভের যোগ থাকে। এক যোড়া বায়ু চালনার যন্ত্র বা জাতা ইহার সহিত সংযুক্ত। এই যন্ত্র শিল্পকর স্বয়ং ভিন্ন আর কেহ ভাল করিয়া বাজাইতে পারিতেন না। তিনি যখন বাজাইতেন, তখন ইহা হইতে ঠিক মনুষ্য কণ্ঠ স্বর বাহির হইত, অঙ্গুলি চালনের দ্রুততা বা মন্দতা অনুসারে স্বর ঘন ঘন বা বিলম্বে উচ্চারিত হইত। ইহা দ্বারা হৃন্দর গানও গীত হইত। এই যন্ত্রটির অনেক ত্রুটি আছে, সেই জন্য ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক কালে সে ত্রুটি সংশোধিত হইয়া যন্ত্রটি আরো আশ্চর্যজনক হইবে সন্দেহ নাই।

ক্ষুদ্র বিষয়ে আর্য্যজাতির আশ্চর্য্য জ্ঞান-বিকাশ।

দাবানলে ঘন দগ্ধ হইলে, যেমন ভাল মন্দ সর্ববিধ তৎকালতা ও অরাজি ভস্মাৎ হইয়া যায়, এই ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ স্বেচ্ছাক্রমেণ ও বিজাতীয় শাসনে অনেক রত্নরাজী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দগ্ধ বনে ভস্মারশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহা যেমন বিকৃত, বিচ্ছিন্ন ও মৃত-প্রায় হইয়া অবস্থিত থাকে, ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশলের চিহ্ন অদ্যাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, ওৎসমুদ্র ই তদবৎ হইয়া রহিয়াছে। দগ্ধ সহকারে ও মন্দারে, চন্দন রুদ্ধ ও শীমূল রুদ্ধে যেমন ইতর বিশেষ বুঝা যায় না, ভারতীয় বহুদর্শী বিজ্ঞানবেত্তাদিগের নিগূঢ় জ্ঞান সম্পন্ন উপদেশ, আদেশ, নিষেধ ও বিধি সকল ভ্রম ও কুসংস্কারের সহিত এমনি মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহাদের কোনটী সত্যমূলক, ও কোনটী ভ্রমমূলক আমরা সহস্র। বুঝিতে পারি না। ইহাতে এই ঘটিয়াছে যে, আমরা ক্রাঙ্কনকেও কাচ বলিয়া পরিচ্যাগ করিয়াছি। বিদেশীয় ও বিজাতীয় বাহ্য আকর্ষণে এবং আশ্রয় প্রাপ্তিতে আত্মদিগের চক্ষুকে এমনি রান্ধাইয়া দিয়াছিল যে যাহা দেশীয় তাহাই ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ ও তাহাই মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু সেই স্রোত এক্ষণে ফিরিয়াছে।

আমাদের উপদেশাদিগের নিষেধ ও বিধান করার দোরেও অনেক ভাল কথা অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহাদের আদেশ সকল গ্রহণিকাৰণ। একটা কার্যের কারণ ও ফল সম্বন্ধে কিছুই বাজ করা হয় নাই; কেবল ইহা করা কর্তব্য, তাহা করা অকর্তব্য, খোটে এই মাত্র বলিয়া রাখা হইয়াছে। আদেশ লভ্বনের মণ্ড বিধি এমন অর্থোক্তিক ও অসম্ভব, যে নিতান্ত জ্ঞানাত্ম ভিন্ন কেহই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু যদিচ কার্যের কারণ ও ফল সম্বন্ধে বিশেষ বাখ্যা করা হয় নাই, তথাপি যাহারা বিধানকর্তা তাহারও তত্ত্ববিবরণের কারণ এবং ফল জানিতেন না এমন কখনই নহে। বিশেষ রূপে বুঝাইয়া না দেওয়ার কারণ স্বতন্ত্র থাকিবে। বোধ হয় যে ভাব হইতে ওঁকার শূত্রের অনুচ্চারণ, ও বৈদ্য শূত্রের অস্পর্শ-নীতি, করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই ভাব হইতেই এসকলেরও বিশেষ জ্ঞান বিবৃত হয় নাই।

সে যাহাই হউক, আর্ধ্য-বিজ্ঞানবিৎদিগের আদেশ ও বিধি, বর্তমান সময়ে কিরূপ অবস্থানিত ও পাদ-দলিত হইয়াছে; সেই অবস্থান হইতে কিরূপ বিব-ময় ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে, তদনুসরণ পূর্বক তাহাদিগের মর্মান্ব যথা-মাধ্য প্রকাশ করাই আমাদিগের বর্তমান উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল তৎপক্ষে কতদূর কৃতকার্য হইব, তাহা সাধারণের বিবেচনা সাপেক্ষ। পুরাকালের কোন নিগূঢ় কল্পার সম্ভাববোধ করাই তুচ্ছ ব্যাপার। বিশেষতঃ আমরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তাহার অনেক স্থলেই অসম্ভব ভিন্ন অবলম্বন নাই। সেই অসম্ভব অর্থোক্তিক ও বর্তমান সময়ের জ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলে কে বা তাহা গ্রহণ করিবে? এতলে ইহাও বলা আবশ্যিক যে, যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে তৎ সমুদয়ই যথার্থ বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রতিপন্ন করিতে পারিব কি না সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে জনশ্রুতিও আমাদিগের অবলম্বনীয় হইবে।

প্রথমঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করিব। দ্বিতীয়ঃ যে যে গভীরতর বিষয়ের বিবরণ করা যাইবে, তাহাদিগকে যথাক্রমে পর পর বর্ণন করিতে ক্রমী করিব না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে হই একটি উদ্ভট শ্লোক ও পারিতোষিক কথা উদ্ধৃত করিয়া তদ্বাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১। কুৎপতনে উজ্জ্বল জীবিতীয়া লক্ষণঃ।

শত্রোরপি চ কৰ্ত্তব্য, অন্যথা তদ্বোধঃ৷

পত্ররত কুৎপতনে অর্থাৎ হাঁচিবার কালে, এবং উজ্জ্বল জীবিতীয়া লক্ষণঃ হাই তুলিবার কালে “জীব তিষ্ঠে” বলিবে এবং অঙ্গুলি ধ্বনি করিবে। তাহা না করিলে উক্ত ব্যক্তির বধভাগী হইতে হইবে।

পাঠকগণ দেখিলেন তো, কি অপরাধে, কেমন দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। এই অপরাধে আমরা কত লোকের বধভাগী হইয়াছি তাহার ইয়ত্তা কি?

এখানে দেখা যাউক উক্ত অ'দেশ শু তল্লভবনে এই শুভতর দণ্ড দানের মূল কোথায়। ক্লান্তি হইলে হাই তোলা স্বভাবিক এবং তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ক্লান্তিদূর হয়। যত অধিক পরিমাণে হাঁ করিয়া হাই তোলা যায়, ততই অধিক আরাম বোধ হয়। এ স্থলে দুইটী বিপদাশঙ্কা আছে। হাই তুলিবার সময়ে গতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস লওয়া হয় অথচ সেই সময়ে মুখ গহ্বর প্রসারিত থাকে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস জ্যোত সজোরে বহিষ্কৃত হইয়া, কুটা, পোকা পতঙ্গ প্রভৃতি মুখ গহ্বর অধ্যস্ত করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। যদি ঘটনা ক্রমে উক্তরূপ আগন্তুক দ্রব্য বায়ুনলীতে প্রবেশ পথ পায় এবং তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিতে পারে, তজ্জনিত উত্তেজনার বহুবিধ প্রাণ নাশক রোগোৎপত্তি হইতে পারে। বায়ুনলীর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রিত বিভাগে যতই উক্ত আগন্তুক দ্রব্য প্রবেশ করিবে, ততই প্রবলতর রোগোৎপত্তি হইবে। এস্থলে সেই সকল রোগের নাম মাত্র উল্লেখ করিব। Laryngitis (বায়ুনলীর মুখ প্রদাহ), Tracheitis (বায়ুনালীর প্রদাহ); Bronchitis (বাহ্যকোষ সাধারণতঃ কাশ রোগ বলে), Pneumonia ফুস ফুস প্রদাহ ইত্যাদি। এই সকল রোগ বিশেষতঃ প্রথমোক্ত উত্তরোক্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, শ্বাসদোষ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

ল্যারিন্জাইটিস (Laryngitis) রোগে অনেকানেক সুবিখ্যাত ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে। আমেরিকার স্বনামধাত রাজনীতিবেত্তা ওয়াশিংটন এই রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার কার্টক্লিফও, অনেকের মতে, এই রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিপদাশঙ্কা এই যে, হাঁই তুলিবার কালে আত্যাত্তিক মুখব্যাদান করিলে হৃদাশ্বি অর্থাৎ চোয়ালের হাড়ের স্থান বিচ্যুতি (Dislocation of the lower jaw) ঘটিতে পারে। অতএব হাঁই তুলিবার কালে মুখ গহবরের সম্মুখে হস্ততুড়ি প্রদান করিলে আগন্তুক ত্রব্যের প্রবেশ পথ আবৃত থাকে; জীবিত কীট, পতঙ্গ, তুড়িধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রাণভয়ে স্বতঃই দূরে পলায়ন করে। আর যে ব্যক্তি হাঁই তুলিতেছে, সেও মুখব্যাদান বিষয়ে সতর্ক হইতে পারে।

যায় পুর্বে আগন্তুক ত্রব্য সমাগমে কি বিপদাশঙ্কা আছে তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক হাঁই তোলাতেই ঐরূপ ঘটিলে কি আর রক্ষা ছিল। প্রকৃতি জীবদেহকে এমন অভাবনীয় কৌশলে সুরক্ষিত করিতেছে যে, ভাবিলে অশঙ্ক হইতে হয়। চক্ষুতে কোন আগন্তুক ত্রব্যাপাত বা অভিব্যতির সম্ভাবনা হইতে না হইতেই, অন্তর্কিতভাবে পক্ষপুটে চক্ষুকে আবৃত করিয়া ফেলে। যদি এক অস্থপলের তরে চিন্তা করিয়া চক্ষুর পাতা ফেলিতে হইত, তাহাহইলে প্রতিদিন চক্ষুতে নিশ্চয়ই এত আঘাত লাগিত যে, আমরা চক্ষুমান হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না। ঠিক সেইরূপ কোন বাহ্য বস্তু বায়ু নলীর দ্বারে যাইতে না যাইতেই তথায় উত্তেজনা জন্মে। সেই উত্তেজনা তত্রিণাস্ত স্নায়ু দ্বারা লব্ধমজ্জায় নীত হয়। তথা হইতে সেই উত্তেজনা দ্বিগুণ বলের সহিত ফ্রেনিক (Phrenic nerve) স্নায়ু দ্বারা প্রত্যাগত (Reflexed) হয়। এই ফ্রেনিক স্নায়ু বহু শাখা প্রাণাধার বক্ষ ও উদর গহবর দ্বয়ের ব্যবধায়ক পেশীর (Diaphragm) তলদেশে বিন্যস্ত আছে; সুতরাং এই স্নায়ু সকলের উত্তেজনায় উক্ত পেশীর ক্রিয়াধিকা অর্থাৎ আক্ষেপ (Spasm) উপস্থিত হয়। এই টৈশিক আক্ষেপ হইতেই স্বেপ্তন অর্থাৎ হাঁচি হয়। হাঁচির বলে আগন্তুক ত্রব্য সজোরে বহির্নিষ্কল হইয়া যায়। এতগুলি কার্য চক্ষুর নিমেষ মাত্রের সম্পাদিত হয়। অণাধ জ্ঞানময় ঈশ্বরের কেমন অভাবনাগ কার্য কৌশল!

স্বেপ্তন হইলেই বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হইল। তখনই আশীর্ব্বাদ সূচক বাক্য “জীব তিত্ত” সমুচ্চারণ করিতে আদেশ আছে। অপদাশঙ্কা

বিদূষিত হইলে আশীর্বাদ বাধ্য স্বভাৱেই মনুষ্য হৃদয় হইতে সমুৎপন্ন হয়।
ইহা অনৈসর্গিক নহে।

অল্পলৌক্যনি দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানিয়া, এই কাথোর কিঞ্চপ
ভাসাজনক অপব্যবহার হইতেছে তাহা আমরা আগামীতে আদর্শন পূর্বক
অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

(ক্রমশঃ)

আসামীয় জাতি।

আসামবাসীদিগের শারীরিক গঠন প্রণালী দৃষ্টে বোধ হয় তাহারা বাঙ্গা-
লির অপেক্ষা অধিক বলবান, কিন্তু অত্যন্ত অহিফেন সেবন করাতে নিম্নশ্রে-
ণীর লোকেরা এক প্রকার অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার নিম্নশ্রেণীর
লোকদিগকে বড় কানিয়া বা অত্যন্ত 'আফিংখোর,' বলিলে, সন্দেহ হয়। ইহারা
অহিফেন সেবাকে সম্মানের চিহ্ন মনে করে।

আসামীয় জাতিদিগের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জী-
লোকেরাই সেই স্বাধীনতা উপভোগ করে। ভদ্র মহিলারা বঙ্গীয় মহিলাদিগের
ন্যায় গৃহে বদ্ধ হইয়া থাকেন। যে জীরা স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করে,
তাহারা হীনসাহস নহে, বরং এই শ্রেণীর পুরুষ অপেক্ষা জীলোকেরা
অধিক সাহসী।

পুরুষেরা বুদ্ধিমান ও চাহুরীকুশল, জীরা শিল্পী। যদি আসামস্থ বালক
বালিকারা রীতিমত শিক্ষা পাইত, তাহাহইলে আসামের সকল প্রকার
উন্নতির দ্বার অতি সম্ভব উন্মুক্ত হইতে পারিত। এ প্রদেশীয় কি ভদ্র কি
অপদ্র শ্রেণীর লোক, সকলেরই গৃহে সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হই, এতী
মুগা প্রভৃতি বস্ত্রই সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু কার্পাস নিষিদ্ধ
বস্ত্রও পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল বস্ত্র প্রায়
জীলোকেরাই বয়ন করেন। ইহা ভিন্ন অপরাপর শিল্প কার্যোও ইহারা
দক্ষ। সধবা জীলোকেরা কার্পাসনিষিদ্ধ বস্ত্র-পরিধান বিধবার চিহ্ন মনে
করিয়া উক্ত বস্ত্র আপনাদের অঙ্গে ধারণ করেন না। মুগা বস্ত্রই সধবাদিগের

পারিত। এই স্থানে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য দ্রুতগতি নাই, হুতরাং সকল সম্প্রদায়স্থ মহিলারা বস্ত্র বয়নকে গৃহকাণ্ডের মধ্যে গণনা করেন। হুত-বস্ত্র-প্রিয় বৈষ্ণব মহিলাদিগের ন্যায় আসামবাসিনীরা উক্ত বস্ত্রের আদর করেন না, বস্ত্র ঘুণাই করিয়া থাকেন।

এই প্রদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রের নাম রাহা ও মেথলা। রাহা ও মেথলা সাধারণতঃ সূতা দ্বারা নির্মিত, আত্ম লোকেয়া গরম ও অপরাপর পশমী বস্ত্র দ্বারা রাহা ও মেথলা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পরিবারস্থ মহিলাদিগকে অর্পণ করেন। মেথলা বালিশের খোলের ন্যায় শিলাই করিয়া কটিদেশে গ্রন্থি বন্ধন পূর্বক পরিধান করে, রাহা কটিদেশস্থ বস্ত্রের সহিত সংলগ্ন হইয়া সমস্ত গাত্র সুন্দর রূপে আবৃত করিয়া দেয়। প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমনের সময় কেহ কেহ ওড়নাও ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্তমান সময় রাহা ও মেথলার সহিত কোন কোন স্থানে একটা করিয়া কামিজ ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়ে আসাম বাঙ্গালা অপেক্ষা অনেক সভ্য।

আসামে ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপর কোন জাতির মধ্যে বাল্য বিবাহ এবং রীতি মত বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই বলিলেও হয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির মধ্যে প্রথমতঃ গাছকঁড় বিধানে বিবাহ, অবশেষে রীতিমত বিবাহ হইতে হইতে পারে। গাছকঁড় বিধানে বিবাহিত দম্পতির পুত্র কন্যা দ্বি-সামাজিক নিয়মে উত্তরাধিকারী হইতে পারে। কিন্তু কেহই বিশেষতঃ বিত্তশালী লোকেয়া দুই একটি পুত্র কন্যা হইলে পরে গাছকঁড় বিবাহিত স্ত্রীকে পুনরায় রীতিমত বিবাহ করে, এই বিবাহকে হোম জালানি বিবাহ কহে। এই দেশীয়দিগের বিশ্বাস হোম জালানি বিবাহ না হইলে হাতের জল শুষ্ক হইতে পারে না, তাহার জন্য অশীতিবর্ষ বয়স রুদ্ধ বৃদ্ধাবস্থা অস্তিম কালের পূর্বে একবার হোম জালানি বিবাহ হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহার পুত্র কন্যাদির হোম জালানি বিবাহ হইতে পারিবে না। কেনই বা হইবে? পিতা মাতার বিবাহ না হইলে পুত্র কন্যার বিবাহ হওয়া কি সম্ভবপর? কিন্তু আসামীয়দিগের মধ্যে অভাব দূরিতব্য আছে। দুইটা বা ততোধিক পুত্র বা কন্যা হইয়া অবিবাহিত পিতা বা মাতার লোকান্তর গমন হইল, এমন সময়ে পুত্র বা কন্যার যদি বিবাহ উপস্থিত

হয়, তখন একটা কদলী বৃক্ষের সহিত একতরের বিবাহ হইলেই পুত্র বা কন্যার হোম জালানি বিাহ হইতে পারে।

আমাদের কোন বন্ধু আসামের এক বিচারালয়ে বিচারপতির কার্য্য করেন। তাঁহার নিকট অশীতি বর্ষ বয়স্ক এক বৃদ্ধের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল। বিচারের দিন দাখী হইলে উক্ত বৃদ্ধ বলিল মহাশয় বিচারের দিন পরিবর্তিত করিলে ভাল হয়। বিচারপতি বলিলেন “ কেন ? ” সে বলিল “ আমার পুত্র কন্যারা আমাকে বিবাহ দিবে। ” তিনি বলিলেন “ এত বয়সে তুমি আবার বিবাহ করিবে ? ” সে বলিল “ সে বিবাহ নহে, হোম জালানি বিবাহ হইবে। ”

পাঠিকা এই বিষয় পাঠ করিয়া মনে করিতে পারেন মন্দ কি ? আবার সত্যযুগ উপস্থিত, গান্ধীর বিবাহ ত সত্যযুগে হইত। কিন্তু এ সেই পবিত্র গান্ধীর বিবাহ নহে। এই বিবাহ প্রথা দ্বারা যে আসামের কত দূর অনিষ্ট হইতেছে বলা যায় না। নিরুপস্থিত ভাবে যুবক যুবতী মিলিত হইল, কিছু দিন একত্রিত রহিল। পরে একটু মনান্তর হইলেই উভয়ে পৃথক্ হইয়া গেল। আবার উভয়েই মনোমত স্বামী ও স্ত্রী বাছিয়া লইল। এই প্রকার দুই একটা সন্তান হইলেও কেহই স্ত্রী বা স্বামী পরিত্যাগ করে। ঘোয়ালি স্ত্রী বিষয়ক, মোকদ্দমা দ্বারাই আসামের নিম্ন আদালত চলিতেছে। সর্বদাই স্ত্রী ভাগ বা স্বামী ভাগ প্রভৃতি মকদ্দমাতে বিচারকেরা ব্যস্ত থাকেন। এই কুপ্রথা যদিও আসাম হইতে শীঘ্র বিদূরিত না হয়, তবে সে এ প্রদেশের কি অনিষ্ট ঘটবে, তাহা কল্পনা দ্বারাও অনুভব করা যায় না।

ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত কলিতা ভিন্ন অপরাপর সকল জাতির মধ্যেই বিবাহ প্রণালী এক প্রকার নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিবাহের পূর্বে ভাবী জামাতাকে খণ্ডর গৃহে বনবারি বা চাকরি করিতে হয়। এই প্রকারে যে কত দিন চাকরি করিতে হইবে তাহার নিরূপণ নাই। এই প্রকার বাস করিতে করিতে যদ্যপি খণ্ডর সম্বন্ধ হইলেন তবে জুড়ন সম্বন্ধ নির্ণয় হইবে। এই অনুষ্ঠানে ভাবী বরকে কন্যার নিমিত্ত রীহা, খেলানা, প্রভৃতি বস্ত্র, খুরিয়া মণি মাছলি কেরা প্রভৃতি অলঙ্কার দিতে হয়। এক একজন ছুই প্রকৃতির লোক আছে বনবারি ও জুড়ন হইয়া গেলেও সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া দেয়। অপর আর এক জনকে আবার বনবারিতে নিযুক্ত করে। আবার তাহার সঙ্গে জুড়ন হয়। পুনর্বার

সম্বন্ধ ভঙ্গ করে। এই প্রকারে তাহার একটা ব্যবসা হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে আবার এই প্রকার হইয়া উঠে যে, কন্যা এই সকল ব্যাপার অসহ্য বোধ করিয়া মনোমত এক যুবকের গৃহে প্রবেশ করে।

প্রথম ঋতুর পূর্বে ইহাদের মধ্যে বিবাহ হইবার পদ্ধতি নাই। প্রথম ঋতু হইলে দেশীয় রীতি অনুসারে যে স্ত্রীর বিবাহ হয়, তাহাকে বাকানোরিয়া বা ঋতুরিয়া বলে। এই বিবাহেতে যে অর্থব্যয় পড়িবে, তাহা ভাবী বরকে দিতে হইবে। এই ঋতু বিবাহের পরই বর বিবাহ অর্থাৎ হোম জালানি বিবাহ হইবে। ঋতু বিবাহ হইলে পর আর সম্বন্ধ ভঙ্গ হইতে পারে না। এই প্রকার বিবাহ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এই প্রদেশে মচরাচর পুর্বোন্নিবিষ্ট গান্ধার্ক বিবাহই প্রচলিত। পূর্বে যে প্রকার বিবাহ প্রণালীর বিবরণ লেখা হইল তাহা সমস্ত আসামে প্রচলিত কিনা বলিতে পারি না, শিবসাগরে উক্ত প্রকার রীতি প্রচলিত আছে।

মুসলমান বীরাজনা ।

পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোন জাতি বীরধর্মের জন্য জগৎ বিখ্যাত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অগ্রে বীর রমনীর আবির্ভাব হইয়াছে। বীর প্রমথিনী জননী কখন নিবীৰ্য্য ও ভীর্ণ স্বভাব হইতে পারেন না। রাজপুত, স্পার্টান ও রোমানদিগের ন্যায় আর কোন জাতি বীর পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই, ও ইহাদিগের রমনীগণের সাহসিকতা ও বীরত্ব জগতের অবিদিত নহে। সুতরাং মুসলমান জাতিও অধুনাতন কালে বীরধর্মের সামান্য পরিচয় দেয় নাই। ইহাদিগের কামিনীগণ যে এককালে বীর প্রকৃতি-চীন হইবে এতপ বিশ্বাস আমরা মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারি না। মুসলমান জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়াও আমরা দেখিতে পাই, ইহাদিগের মধ্যেও স্পার্টানদিগের ন্যায় বীরমাতা এবং রাজপুতদিগের ন্যায় বীরভাৰ্য্যা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমরা নিজে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। এই স্থলে বঙ্গদেশীয়া পাঠিকাগণের প্রতি বক্তব্য, বাঙ্গালী জাতি ভীর্ণ বলিয়া সকলের নিকট নির্দিত ও হয়। কিন্তু যে দিন বঙ্গনারীগণ

সাহসবলী ও বীরশ্রুতি হইয়া উঠিবেন, সেই দিন বাঙ্গালী জাতিও বীর
ধর্মাক্রান্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। এখন আমরাদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ ভীত
উত্তেজক হইয়া আছেন, এটুকুনা তাঁহাদিগের গর্ভজাতগণ এত কাপুরুষ
তাঁহারা সাহস ও বীরত্বের উত্তেজক হউন, বাঙ্গালীজাতিকে ভিন্ন-প্রকৃতি
ঘেরিতে পাইবেন। স্ত্রীলোকগণ সর্বত্র অসি চর্চ্চা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বাইবেন
ও বীরদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন আমরা একথা বলি না, গৃহে বসিয়া তাঁহা-
দিগের বাক্য, ভাবে ও ব্যবহারে তাঁহারা বীরদৃষ্টান্তের শিক্ষাদান করিতে
পারেন, তাহাই আমরা দেখিতে চাই।

করবলার প্রাস্তরে তুরাঙ্গা জিন্নাদের সৈন্য দল মহাত্মা মহম্মদের প্রিয়
মৌহিয় পরম ধার্মিক হোসেনকে অকারণে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার
উপক্রম করে, সেই সময় কোমর নায়ী বীরনারী স্বীয় তনয় ওহেবকে হোসে-
নের শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যেক্ষেপে উত্তেজনা করেন, তদ্বিবরণ
পারস্য পুস্তক ‘রোজতঃ সহদা’ হইতে আমরা অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ওহেব নামক রূপ গুণসম্পন্ন এক যুবক ছিল। তাহার পরিণয়ের পর সতর
দিন মাত্র অতীত হইয়াছিল। তখনও সে দাম্পত্য প্রণয়ের সুধাবদ করে
নাই। তাহার মাতার নাম কোমর। জননী অসিরা তাহাকে বলিলেন
“হে আমার হৃদয়-বাসী পুত্র! গৌরবান্বিত যুবক! আমার ক্ষীণ চক্ষুর
আলোক! পরিত্রাণ চিত্তের আনন্দ! প্রাণদীপের জ্যোতিঃ তোমার
প্রতি আমার এরূপ গাঢ় স্নেহ যে আমি তোমাব্যতীত মুহূর্তকাল যাপন
করিতে পারি না। স্বপ্নে ভাগরণে তুমি আমার হৃদয়ে আছ। কিন্তু বিবেচনা
করিতে হইবে, প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদের স্তন্যের পন কুমার হোসেনকে
এই বিপদ সঙ্কুল করবলার প্রাস্তরে কতকগুলি দুঃখী লোক আক্রমণ
করিয়া বিপন্ন করিয়াছে। আমি ইচ্ছা করি তুমি স্বীয় শৌণ্ডিত্যের দ্বাবত
আমাকে উৎসর্গ কর। তাহাহইলে তুমি যে আমার স্তন্য পান করিয়াছ,
উহা তোমার সঙ্ক্ষে বৈধ হইবে। আমার এই অভিলাষ যে প্রেমের
আধারে তোমার প্রাণধন স্থাপন করিয়া কুমার হোসেনের নিকটে উপস্থিত
কর। তাহা করিলে পরণোকে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিব। হে
আমার প্রাণস্বরূপ পুত্র। যাও সেই মহাত্মার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর, স্বীয়

মার্গাঙ্কসারী বীর পুরুষদিগের ন্যায় সংসারের অর্থলালসা পরিত্যাগ কর, স্থগাশাকে পদাঘাত করিয়া বন্ধুর অভিমুখে চলিয়া যাও, এ বিষয়ে একাগ্র হও, সংসারকে পশ্চাতে রাখিয়া দেও, প্রেমের পথ গ্রহণ, বুদ্ধির ভাব বিমর্জ্জন কর, বন্ধুর নম্রিক আসন লাভ কর, বিপদনে প্রার্থনা কর।”

ওহেব বলিল “স্নেহময়ি জননি! কুমার হোসেনের প্রতি আমার প্রাণগত ভালবাসা তাঁহার জন্য প্রাণ দানে ক্ষতি মনে করি না। কিন্তু সেই নব পরিণীতা ভাষা যিনি এই বিদেশে আমার সহচরী হইয়া আছেন, আমার মন তাঁহার বিষয় ভাবিতেছে, তিনি এখনও আমার প্রণয়ের কবভোগ করেন নাই। তুমি অনুমতি কর, আমি তাঁহার নিকটে যাই ও তাঁহাকে বুঝিয়া বিদায় লইয়া আসি।” জননী বলিলেন “যাও, কিন্তু দ্বীলোক নির্বোধ, সাবধান। সে কুহক কুমন্ত্রণাতে যেন তোমাকে প্রতারণা না করে। তুমি তাহার কথায় স্থায়ী সম্পদ-চিরকালের সৌভাগ্য হইতে যেন বঞ্চিত না হও।” ওহেব বলিল “মাতঃ! তুমি নিশ্চিত থাক, আমার প্রাণ কুমার হোসেনের প্রণয় রজ্জুতে এরূপ বদ্ধ নয় যে প্রবঞ্চনার অঙ্গুলি দ্বারা কেহ মেই গ্রাস্তি উন্মোচন করিতে পারে। প্রেমের ছবি আমার হৃদয়কলকে এরূপ অঙ্কিত নয় যে প্রতারণা বারি তাহাকে দৌত করিতে পারে।”

অতঃপর সুবক পত্নীর নিকটে আগমন করিয়া বলিল “হে আমার শ্রিয়তম ভার্য্যে! হৃদয়ের প্রণয়িনি! অদ্য এই করবলার প্রান্তরে মহাপুরুষ মহম্মদের বংশধর কুমার হোসেন বিপদাপন্ন, উপায়হীন ও নিসেহায়, স্বদেশ ও স্বজনচ্যুত। ইচ্ছা যে আমার জীবন সম্পত্তি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করি, স্বর্গযুদ্ধে প্রাণদান করিয়া সৌভাগ্য সঞ্চয় করি, তাহা হইলে পরলোকে ঈশ্বরের প্রসন্নতা, মহাপুরুষ মহম্মদের আত্মকুল্য, কুমারের জনক জননীর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার আমার প্রাণের সখী ও সহায় হইবে।” ইহা প্রণয় করিয়া বুঝী আশা ও উৎসাহের সহিত বলিল “হে আমার সন্তাপহারী বন্ধো! জীবনের সখা সহস্রপ্রাণ কুমার হোসেনের কিঙ্করদিগের জন্য উৎসর্গ হউক। যদি শাস্ত্রে দ্বীলোকের বুদ্ধ করিতে বিধি থাকিত, আমি কুমারের জন্য সংগ্রাম করিয়া প্রাণদান করিতাম। কিন্তু একটা কথা, আমি নিশ্চয় জানি যে যিনি অদ্য কুমারের জন্য প্রাণ দিবেন,

কলা তিনি পবিত্র স্বর্গের প্রান্তরে গৌরবের বাহনে ভ্রমণ করিবেন এবং স্বর্গীর প্রাসাদে অপ্সরা বিদ্যাদরীগণের সঙ্গে সন্মিলিত হইবেন। অতএব এস কুমারের নিকটে যাই, ও তুমি তাঁহার সমিধানে যাইরা এই প্রতিজ্ঞা কর যে একে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবে না, সেই নিত্যাধামে আমি তোমার সহায় ও সঙ্গিনী বন্ধু থাকিব।” ওহেব বলিল “উত্তম কথা।” পরে উভয়েই হোসেনের নিকটে উপস্থিত হইল। যুবতী ব্যাকুলভাবে কণ্ঠস্বরে বলিল “কুমার! শ্রদ্ধা হ্রাছিত্বার্থে যাহারা ভূমিশায়ী হয়, স্বর্গের অপ্সরাগণ দ্বীয় অঙ্কদেশ তাহাদের মস্তকের উপাধান করিয়া থাকে। পরলোকে তাহারা তাহাদের সখী সহচরী প্রণয়িনী হয়। এই যুগক প্রাণদানের প্রার্থী, আমি তাহার প্রণয় হুথ সম্ভোগ করিতে পারি নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি এখানে নিরাশ্রয়া নিঃসহায়া। এখানে আমার পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় বন্ধু কেহই নাই। আমার প্রার্থনা যে কেয়ামতের দিন * যেন ইনি আমাকে তত্ত্ব করেন, আমারে পরিত্যাগ করিয়া যেন স্বর্গলোকে চলিয়া না যান—পরন্তু এই অনাথাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করেন, যেন আমি তোমার কন্যা ও ভগিনী মণ্ডলীর মধ্যে থাকিতে পারি। আমি তোমার অন্তঃপুরে তোমার একজন কিস্করী হইয়া থাকিব। তাহাই হইলে আমার পবিত্রতার প্রতি কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।” হোসেন যুবতীর কথা শুনিয়া অশ্রুবর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহার বন্ধুগণও কাঁদিয়া উঠিল। ওহেব আফ্লাদ সহকারে পত্নীর সকল কথার সম্মতি দান করিয়া অঙ্গীকারে বদ্ধ হইল ও তাহাকে হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিল। তৎপরে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া সমরক্ষেত্রে উপনীত হইল। প্রবল পরাক্রমে সংগ্রাম করিয়া শত্রু পক্ষের শত শত বীরপুরুষকে শমন সদনে প্রেরণ করিল, পরিশেষে শত্রুর করবালের আঘাতে ছিন্নকর্ত্ত হইয়া পরলোকে চলিয়া গেল। জননী তাহার ছিন্ন মস্তককে আলিঙ্গন করিয়া চুমন করিলেন এবং বলিলেন তুমি “বন্য বন্য! তুমি মহাকার্য্য করিয়াছ, তুমি আমার বথার্থ পুত্র, তুমি আমার প্রাণ। এইক্ষণে আমার পূর্ণ প্রসন্নতা তোমার লাভ হইল।” তৎপরে মাতা সেই মস্তক

* মুসলমান শাস্ত্রে পাপপুণ্য বিচারের জন্য, এক নির্দিষ্ট দিন আছে। সে দিন সকল মৃতবান্ধি কবর হইতে উত্থান করিবে। তাহাই কেয়ামত।

বধূর কোড়ে সমর্পণ করিলেন । বধু অঙ্গন শলাকায় স্বামীর মস্তকের শোণিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বীয় নেত্রদ্বয় রঞ্জিত করিল ।

অলঙ্কার ।

সম্ভ্রম প্রীতি ।

(১২৯ সংখ্যার পর)

শেষবারে যখন আমরা অলঙ্কারের বিষয় লিখি, পাঠ ভেদে প্রীতির বিকাশ জলি লিখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি । সে প্রতিজ্ঞা বহু কারণে পূরণ হয় নাই । আমরা পার্থক্যগণকে পুনরায় এ বিষয় অবগত করিতে প্ররম্ব হইলাম । "কোন সময় কোন প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইবে আমরা জানি না । সুতরাং এবারকার যত্নও কত দূর কৃতকার্য হইবে, আমরা বলিতে পারিতেছি না ।

দাদা, প্রভু, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, বন্ধু এবং মনুষ্য আমরা প্রীতির অবলম্বন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি । ইহাতে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সঙ্গে আমাদের প্রথমের মতভেদ উপস্থিত হইল । তাঁহারা প্রীতিকে রসের মধ্যে আদি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহারা দম্পতীর প্রণয়েই আবদ্ধ রাখিয়াছেন । তাঁহারা প্রীতিকে কেন এক স্থানে আবদ্ধ রাখিলেন, ইহার কারণ নির্দেশ করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে । সচরাচর প্রীতির প্রগাঢ় ভাব দম্পতীর মধ্যেই লক্ষিত হয় এবং প্রীতির যত প্রকার বিকাশ আছে, তাহা তত্ত্বিন্ন অন্যস্থলে সাধারণতঃ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । যাহা অতি সাধারণ, সকল লোকের চক্ষেই পড়ে, কার্যে প্রধানতঃ তাহাই বর্ণনার বিষয় । তাঁহারা এই জন্যই প্রীতির অন্যান্য বিকাশ ছাড়িয়া দিয়াও বৎসল রসকে (পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ) স্বতন্ত্র একটী রস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ।

কাব্যের বর্ণনীর বিষয় লোকাভীত হওয়া অসুচিত, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? কাব্যাক্রিত যে ছবির সহিত লোকের সহানুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই তাহার বর্ণন নিষ্ফল ও উদ্বাস্ত প্রলাপের নাম নিশ্চয়োজন । কিন্তু